নেপালের পথে

শ্রীসুধীরকুমার আচার্য্য
(এ্যাডভোকেট্ কলিকাতা হাইকোর্ট)
শ্রীরমেশচন্দ্র সাহা বি, এ

বরেন্দ্র লাইব্রেরী

প্রকাশক—
শ্রীবিজনকুমার আচার্য্য
৮নং নীলাম্বর মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
ভাদ্র ১৩৪৩

প্রিণ্টার—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ,
আইডিয়াল প্রেস
১২।১, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। বাংলা ভাষায় ভ্রমণ বৃত্তান্তের বড়ই অভাব, এই অবস্থায় ভ্রমণ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের কার্য্যে উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি। গ্রন্থকার শিবরাত্রির সময় পশুপতিনাথের মেলা দর্শন করিতে নেপালে গিয়াছিলেন। পথের বর্ণনাটী সরল ও মনোজ্ঞ। পশুপতিনাথে যাহারা যাইতে চাহেন এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পড়িলে পথের সুবিধা অসুবিধার কথা অনেক কিছু জানিতে পারিবেন।

ভাদ্র পূর্ণিমা। শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৩৪৩

নেপালের পথে

রমেশের ডায়েরী

নেপালের পথে

অনেক দিন আগের কথা। মাসটা বোধ হয় জানুয়ারী। শীতের মাঝেই ফাল্গুনের হাওয়া দেখা দিয়েছে। Bachelors' league এর open air meeting প্রায় একেবারে বন্ধ। একে হাওয়াটা লীগ 'র পক্ষে খুবই খারাপ, তার উপর সভ্যবৃন্দের অভিভাবকগণ 'লীগ' ভাঙ্গবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। নতুন কিছুর অভাবে প্রাণটাও উঠ্‌ছে হাঁপিয়ে। এমন সময়ে সুধীরদা একদিন চুপি চুপি এসে বল্লেন—'যাবেন, নেপালে?' লাফিয়ে উঠে বল্লাম, 'কবে'? সুধীর দা' বল্লেন, শিবরাত্রির সময়ে। দমে গেলুম, বল্লুম, 'অত দেরীতে, আগে যাওয়া যায় না?' দাদাটী গম্ভীর ভাবে বল্লেন, তার আগে 'pass port' পাওয়া যায় না। নিরুপায় হয়ে বল্লুম, তথাস্তু। মনকে আশ্বাস দিলুম, কারণ শুনেছি নাকি সবুরেই মেওয়া পাওয়া যায়।

শুক্রবার ১৭ই ফেব্রুয়ারী

• ••••দিন গুনতে গুনতে সাতদিনে ঠেক্‌লো। অথচ যাবার কোনও কিছু ঠিক্ কর্‌তে পার্‌লুম না আজও। বন্ধু নিত্যই তাগাদা দেন, কি হ'লো? আস্‌ছে রবিবারের মধ্যে যা হোক কিছু একটা ঠিক করবো বলে বন্ধুকে আশ্বাস দিলুম।

রবিবার ১৯ই ফেব্রুয়ারী

দুপুরে বন্ধুর বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম। চৌকাট্ পেরিয়ে ঢুকতে নজর পড়লো কাল বোর্ডে জ্বল্ জ্বলে সাদা 'আউট' লেখাটার উপর। ভাবলুম দিবা নিদ্রার ব্যাঘাতের জন্য দাদার আমার বোধ হয় এ একটা 'বড়ের' চাল্। কলিং বেলটা টিপতে উৎকলবাসী ভৃত্যটী খবর দিল, 'দাদাবাবু ন' অছি'। বল্‌লুম 'ন অছি ত ন অছি' একটু কাগজ আন দেখি। আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বল্লে, কঁর কউছি'। ভাবলুম আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল হাত নেড়ে অনেক কষ্টে ত' তাকে বোঝান গেল। মিনিট দশেক পরে কোথা থেকে একটা রাস্তার হ্যাণ্ডবিল্ নিয়ে এসে হাজির। ভাবলুম, তবু ভাল, যে একটা শালপাতা

এনে দেয়নি! পকেট থেকে 'ফাউণ্টেন-পেন'টা বার করে লিখতে গিয়ে দেখি সময় বুঝে কালিও গেছে ফুরিয়ে। ভাবলুম, একে যদি এখন কালি আনতে বলি, তাহলে হয় তো মন্দিরে ছুটবে! কাজেই অন্য কোন উপায় করতে পারি কিনা তার চেষ্টা করতে লাগলুম। ছেলে বেলায় পড়া 'Necessity is the Mother of Invention' বাস্, সামনে দেখি সুধীরদা'র ঘর ধোয়া একটু জল দরজার কাছে জমে। 'সেলফ্ ফিলার' দিয়ে একটুখানি সেই জল কলমে ভর্ত্তি ক'রে নিয়ে লিখলুম, Get ready, রাত্রে আসছি।' রাত্রে এসে দু'জনে অনেক ভেবে চিন্তে আগামী কাল (অর্থাৎ সোমবার) রাত্রি সাড়ে নটায়, ১১ আপ দানাপুর এক্সপ্রেসে মোকামা ঘাট হয়ে রক্সোলে যাওয়া ঠিক করলুম।

সোমবার ১৭ই ফেব্রুয়ারী

বিকালে 'রেলওয়ে সিটি বুকিং অপিসে' গেলুম দু খানা টিকিট ক'রতে। কাটা ঘুল্ ঘুলি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম; আচ্ছা রক্সোলের রিটার্ণ টিকিট পাওয়া যায়? উত্তর এলো—"Certainly you can get inter-class eigh-

teen-days-return ticket which will cost you eigheteen rupees."

বাঙ্গালী দেখে বাংলাতে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম। যা হোক উত্তর এলো ইংরাজীতে, ভাড়া সমেত। বল্লুম, Thanks, can you tell me how many miles it is from Calcutta ?

—Oh yes, about four hundred and fifty eight, just in the borderline of the British government—Thanks; Two tickets please.

টিকিট দু' খানা হাতে নিয়ে বাঙ্গালী সাহেবকে ডবল 'থ্যাঙ্কস্' দিতে দিতে বাড়ী ফিরে এলুম। * * * * কল্‌কাতার বুকে সবে তখন সন্ধ্যা নামছে। দূরে আকাশে সোনালী রঙ্ ধরেছে। ছোট্ট এক টুক্‌রো কাল মেঘের ধারে ধারে সোনালী আলোর 'বর্ডার'টাকে দেখাচ্ছিল ঠিক বড় লোকের বাড়ীর দামী বিলাতী অস্পষ্ট ছবির উপরের গোল্ড গিল্‌টের ফ্রেমের মতন।

ছোট সুটকেস হাতে চল্‌তে চল্‌তে এমন অনেক কথাই ভাবছিলাম। সুধীরদা'র বাড়ী পৌছে দেখি,—

আসন পাতা মায় জলের গ্লাস পর্য্যন্ত হাজির। বিনা বাক্যে বসে পড়লুম।

খেয়ে দেয়ে মটরে চড়লুম। আমি সুধীরদা' আর তাঁর ভাইপো বিজন, আমাদের বার্ত্তাবহ ভগ্নদূত।

রাস্তার মাঝে হঠাৎ মটর গেল থেমে। বন্ধুকে বল্লুম, 'Morning shows the day'। উত্তর পেলুম, এই করেই জাতটা গেল।

প্রায় মিনিট দশেক পরে আমাদের বাহন গা ঝাড়া দিয়ে উঠ্ল। 'জয় বাবা পশুপতিনাথ বলে আমরা নড়ে চড়ে বসলুম।

ষ্টেশনে এসে দেখি ট্রেণ সবে 'ইন্' করেছে। কম্পার্টমেণ্ট গুলি ঘোর অন্ধকার। রেল কোম্পানীর মিতব্যয়িতা দেখে খুসী হলুম এই ভেবে যে আলো একটু কম পুড়লে রেলভাড়াও হয়তো বা একটু কম্তে পারে। আর ভাড়া কম্লে আমাদের মত বহির্মিয়ানদের দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ানরও একটু আধটু সুবিধে হয়।

একটা ছোট দেখে কামরায় উঠা গেল। সাম্না সাম্নি দু'টো বেঞ্চে আমাদের কম্বল দু' খানা পেতে ফেল্লুম।

সুটকেশ দু'টো ভার খানিকটা ক'রে গায়ে জড়িয়ে বালিসের আকার ধারণ করল।

বন্ধুবরকে প্রহরী রেখে প্লাটফরমে নেমে পড়লুম খুঁজে দেখতে আমাদের মতন দু' একটা 'ছন্নছাড়া' আর কেউ আছে কি না। ঘুরতে ঘুরতে এন্‌জিন ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলুম। একটুখানি ফিকে চাঁদের আলো পথ ভুলে টিনশেড্ ডিঙ্গিয়ে প্লাটফরমের প্রান্ত সীমায় এসে পড়েছে। সেইখানে দাঁড়িয়ে কল্পনার তুলি দিয়ে মানস পটে নেপালের একটা রূপ আঁকছিলাম। হঠাৎ, ফিল্মে দেখা মহাযুদ্ধের রণ হুঙ্কারের মত ভীষণ কোলাহলের শব্দে চমকে উঠলাম।

দ্রুত পদে বন্ধুবরের অবস্থা দেখবার জন্য কামরার দিকে এগিয়ে চল্লুম। ফিরে গিয়ে দেখি অন্ধকারে একটী কোণে দাদাটী চুপ চাপ বসে আছেন আর তাঁর সাম্‌নে স্তুপাকার জিনিষ পত্র...যেন গৌরী শঙ্করের ছোটখাটো এক পকেট এডিসন্।

বল্লুম, দাদা বসে বসে কি আলাদীনের প্রদীপ ঘস্‌ছিলে নাকি? হাসতে হাসতে বন্ধুবর বল্লেন, এক ভদ্রলোকের

বাড়ীতে বিয়ে, তাই কলকাতা থেকে বাজার করে নিয়ে যাচ্ছেন। বল্লুম, যাক্ তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণটা খেয়ে নেওয়া যাবে। বন্ধুবরের চোখের ইসারায় পিছন ফিরে দেখি ভদ্রলোক তাঁর ছোট্ট মেয়েটীকে নিয়ে আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে হাসছেন। অমায়িক হাসি হেসে তিনি বল্লেন সে ত' আমার সৌভাগ্য। তারপর আমাদের দু'জনকে তাঁর বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করতে লাগলেন। অবশেষে আমাদের গন্তব্য পথের দোহাই দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করা গেল। বোঝান পর্ব্ব শেষ করে দেখি ক্ষুদ্র কামরাটি 'ওভারপ্যাক্ট'। বারজন বসবার স্থলে কত 'বার' যে বসেছে তার ইয়ত্তা নেই। হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো। আমরা ঠিক হ'য়ে বসলুম। মিনিট পাঁচেক পরে ট্রেনটী আমাদের মতন বাংলামাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে যাত্রা সুরু করলো।

রেখে যাওয়ার আর উপরি পাওয়ার, ব্যথা আনন্দে মনটা তখন মসগুল। খাঁচা ছেড়ে পাখীটা যখন মুক্ত আকাশের দিকে উড়ে যায়, পিছন ফিরে শূন্য পিঞ্জরের দিকে তাকায় কি না সেই কথাটা তখন ভাবছি!

নেপালের পথে

কথায় বলে চিতা আর চিন্তা! ভাবতে ভাবতে হিমালয়ের বুকের উপর ছোট্ট দেশটার কথা মনে এলো। ভেসে উঠ্‌লো একখানা ছবি, স্রষ্টার মতন অটুট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে জগৎ সভায় যে তার স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে আসছে, যারই উদ্দেশে আমরা চলেছি।

বেঁটে খাটো লোক গুলির কথা,যারা হিন্দু বলে আমাদের মতন পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হয় না। হোক না পথ যতই বন্ধুর, দু পাশে থাক্‌না কেন বিপদের ডাক্, আমারা চলেছি এবং যাবও তার বুকে······ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম হঠাৎ একটা ঝাঁকানি দিয়ে ট্রেণটা থেমে গেল। গোলমালে জেগে দেখি, সীতাভোগ মিহিদানার দেশে এসেছি।

* * * * * *

ইধার আইয়ে, বাবুজি? বিলকুল্ খালি।

কথাগুলির ভিতর কী যাদুছিল জানি না, এক নিমেষে সমস্ত গাড়ী শুদ্ধ লোক সমস্বরে জানিয়ে দিল,—স্থানাভাব। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাঁপাচ্ছেন আর বলছেন—একটা ইষ্টিসান্, মশাই, দয়া

করুন। দরজাটা খুলে বল্লাম, আসুন, একজনের যায়গা, হয়ে যাবে। গাড়ী শুদ্ধ লোক চিৎকার করে উঠলো—ভাবি যে দাতাকর্ণ হলেন দেখ্‌তে পাচ্ছি।

তর্ক করা বৃথা। আবাহমান কাল থেকে চলে আসছে এই ধরণের ব্যবহার। যে যায়গা পায়, সে তখন চায়, যেন আর কেউ না উঠে, গাড়ী তাকে একলাই নিয়ে চলুক।

যাহোক ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বেঞ্চের এক ধারে বসে পড়লেন। কুলি মহাপ্রভু সঙ্গে সঙ্গে এক 'বিরাশী সিক্কায়' সেলাম দিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিল যে বাবুজী এমন সুন্দর ভাবে উঠতে পেরেছেন দেখে সে খুবই খুসী হয়েছে। এবং এইবার বাবুজীর তাকে খুসি করা একান্ত কর্ত্তব্য। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি তাঁর ফতুয়ার পকেট থেকে একটা সিকি বার করে তার হাতে দিয়ে মুখের দিকে উৎসুখ হয়ে চাইলেন, বোধ হয় তার খৈনি খাওয়া দাঁতের একটু হাসি দেখবার মানসে। কিন্তু তাঁর সকল আশা বিফল করে 'কুলি সাহেব' জানিয়ে দিল যে ষোল আনার কমে তিনি খুসী হবেন না। ভদ্রলোকটী বেশ ব্যাকুল ভাবে বল্লেন, 'নিয়ে নাও ভাই, নিয়ে নাও। আমি তোমায়

অনেক বেশী দিয়েছি’। বাবুজীর সাম্যবাদ কুলিকে সন্তুষ্ট করতে পাল্ল না। সে বেশ জোর গলায় জানিয়ে দিল যে ট্রেন এক্ষুনি ছাড়বে। এবং তাকে সত্বর ‘খুসী’ করা প্রয়োজন। ভদ্রলোককে পুনরায় সাম্যভাবের পরিচয় দিতে উদ্যত দেখে এক ভদ্রলোক তাঁকে চুপ করে বসে থাক্‌তে বল্লেন। ভদ্রলোক তখন কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লেন, “মশাই, আমার ত্রিবেণীর জল যে কুলির কাছে রয়েছে।” অনেক জিজ্ঞাসার পর জানা গেল যে ভদ্রলোক ত্রিবেণীতে পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ভবিষ্যৎ পুণ্যের জন্য একটী মাটির পাত্রে ত্রিবেণীর জল নিয়ে দেশে ফিরছেন। কুলি সব জিনিষ পত্র গাড়ীতে তুলে দিয়েছে, কেবল তার বক্‌সিসের Securityর জন্য মাটীর পাত্রটী আট্‌কে রেখেছে।

মনে মনে কুলির বুদ্ধির প্রশংসা করছি, এমন সময় দেখি ভদ্রলোক আবার তাকে অনুরোধ কচ্ছেন, “দিয়ে দাও, ভাই দিয়ে দাও গাড়ী এক্ষুনি ছাড়বে।”

একজন এতক্ষণ গাড়ীর এক কোনে চুপচাপ শুয়ে-ছিলেন। ভদ্রলোককে অমন করে কাকুতি মিনতি করতে

দেখে হঠাৎ উঠে বসে বল্লেন—"শুধু ভাই, ভাই বল্লে চলবে না, গলা জড়িয়ে ধরুন—গলা জড়িয়ে ধরুন।" গাড়ী শুদ্ধ লোক তাঁর কথায় বেশ এক চোট হেসে নিল। তার পর সেই ভদ্রলোক গাড়ীর দরজার কাছে গিয়ে কুলিকে এক ধমক দিতে কুলি মহাপ্রভু লক্ষ্মী ছেলের মত মাটির ভাঁড়টী রেখে চম্পট দিল।

আবার একটানা ছন্দ, "যাচ্ছি যাব ব্যস্ত কেন" সুরে গাড়ী চল্‌তে সুরু করলো। বসে বসে, ঢুলতে ঢুলতে কেউ সহ যাত্রীর কাঁধে মাথা রেখে বেশ একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। কারো বা পা, অন্য এক জনের মাথার উপর চলে গেছে। ঘুমের নেশা পূর্ব্বেকার সব দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে। সবাই চায় কোন রকমে একটু ঘুমিয়ে নিতে, ক্লান্ত শরীরকে একটু আরাম দিতে। হয় তো রাত্রির প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আবার আসবে কোলাহল, আসবে তুচ্ছ কারনে, অকারণে বিবাদ বিসম্বাদ। কিন্তু এখন? যুদ্ধাবসান্তে সৈনিকের মতন যে যেমন করে পারে, মাথা হাঁটু এক করে একটু আরাম করে নিচ্ছে।

দেখতে দেখতে রাণীগঞ্জ, আসানসোল পেরিয়ে গেল।

অদূরে কয়লা-কুঠির কয়লা পোড়াবার আলো হঠাৎ মনে আগুন লাগার ভীত এনে দেয়।

ক্রমে সাঁওতাল পরগনার রাঙামাটীর সরু সরু পায়ে চলা পথ অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখা দেয়। মহুয়ায় পাগল করা গন্ধে মাথার মধ্যে চিন্তা সূত্রের জট পাকিয়ে আসে।

হঠাৎ একটা "গুম্, গুম্" শব্দে নীচে তাকিয়ে দেখি অজয় নদীর পোল। এর পরেই যশিডির ষ্টেশন। সেখান থেকে গাড়ী বদল করে বৈদ্যনাথ-ধামে যেতে হয়। বৈদ্য-নাথের কথা মনে আসতেই তার পৌরাণিক কাহিনী মনে এলো—সেই কবে রাবণ নাকি শিবলিঙ্গ মাথায় করে এনেছিল—সেই সব কথা।

তারপর কখন এই সব এলোমেলো কথা ভাবতে ভাবতে গাড়ীর জানলায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, বন্ধুর ডাকে ধরমড়িয়ে উঠে বস্‌লাম। বন্ধু জানিয়ে দিল গাড়ী কিউল পার হয়ে চলেছে। সামনে মোকামা ঘাট। সেখানে আমাদের নেমে বি এন্ ডব্লু আর এর— ষ্টীমারে উঠতে হবে।

নেপালের পথে

মঙ্গলবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী

দিনের আলো বেশ ফুটে উঠেছে। সামনেই গঙ্গার জলের উপর সাঁতার দিতে দিতে থেমে, ভাসতে থাকা রাজ হাঁসের মত ষ্টীমার খানা দাড়িয়ে আছে। যাত্রীদের গাড়ী থেকে নামতে দেখে সারেঙ সাহেব ভেঁা দিয়ে তাঁর অভিনন্দন জানিয়ে দিলেন। দু'ধারে বালির চড়ার মাঝ দিয়ে সম্প্রতি একটা সরু পথ ষ্টীমার পর্য্যন্ত করে দেওয়া হয়েছে। সুটকেশ ও কম্বল নিয়ে আমরা ষ্টীমারে উঠলাম। কিছুক্ষণ পরে ষ্টীমার ছেড়ে দিল।

দাদাটী উপরে কেলনারের হলে গেলেন চা খেতে। দাড়িয়ে দাড়িয়ে রেলিংএ ভর দিয়ে ছোট ছোট ঢেউ দেখছি। খানিক পরে সুধীর দা' ফিরে এসে বল্লেন—"কি ভাবছ?" বল্লুম, বলা মুস্কিল। কারণ কি যে তখন ভাবছিলাম তা নিজেই জানি না। কখনও হয় তো ভাবছি "কোথা হতে আসিয়াছ নদী? নদী কহিল মহাদেবের জটা হতে।" আবার কখনও "Men may come and Men may go But I go on for ever" প্রভৃতি আবোল তাবোল। মিনিট কুড়ির মধ্যে ষ্টীমার আমাদের সমিরিয়া ঘাটে পৌছে

দিল। সামনে বি, এন্, ডব্লু,আর,এর দেশলায়ের বাক্সর মতন গাড়ী গুলি দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ষ্টীমার ছেড়ে, তাতে চেপে বসলুম। গঙ্গার চড়ার উপর দিয়ে রেলে চলেছে; চারিদিকে বালি আর বালি, যেন মরু সমুদ্র। কোন খানে একটু সমতল বালিমাটির মধ্যে ছোট্ট একটা বুনো গাছের ঝোপ,দু'চারটে ঘাস মাথাতুলে দাঁড়িয়ে আছে,আবার তারি পাশে উচু নীচু ঢেউএর মতন সারি সারি সোনালী বালির ঢিপি চলে গেছে। তার মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে পায় চলা পথ গঙ্গার বুক পর্য্যন্ত নেমে গেছে। হয়তো কাছের গ্রাম থেকে মেয়েরা জল নিয়ে যায়।

প্রায় সাড়ে আট্টার সময় আমরা বারুণী জংসনে (Baruni Jn) পৌছলাম। বারুণী বি, এন্, ডব্লু, আর, এর বেশ বড় ষ্টেশান। আমিন গাঁও—এলাহাবাদ সিটি through passenger পার্ব্বতীপুর, দিনাজপুর, কাটীহার প্রভৃতি বাংলা দেশের ভিতর দিয়ে এসে বিহারের সীমানায় পড়ে। সেখান থেকে বিহারের ভিতর দিয়ে এই বারুণী জংসনে আসে। তারপর Teghra (তেঘরা) Bachhwaraর (বাচোয়ারা) উপর দিয়ে শোনপুর (Sonepur)

ভীমফেরী।
আমলেখগঞ্জ।
নারকাটিগঞ্জ।
রক্সৌল।
বাইরাগনিয়া।
সাগুলি।
জনকপুর।
দ্বারভাঙ্গা।
সামস্তিপুর।
মজাফরপুর।
বাচোয়ারা।
সোনপুর।
হাজিপুর।
দিঘাঘাট।
পাটনা।
বারুণী।
সিমরিয়াঘাট।
মোকামাঘাট।
হাবড়া।
দার্জ্জিলিং
আমিনগাঁও।
গীতালদহ।
কৌনিয়া।
পার্ব্বতীপুর।
কাটিহার।

বাংলা ও বিহার
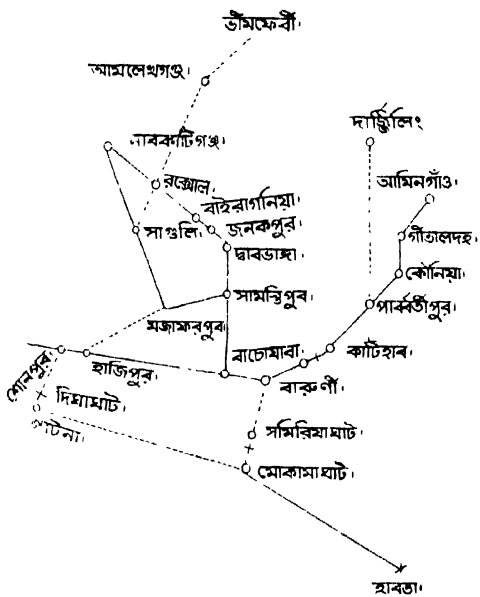
হয়ে বরাবর এলাহাবাদে চলে যায়। সেই জন্য অনেকেই আমিনগাঁও এলাহাবাদ্ সিটি (Amingaon Allahabad City passenger) প্যাসেন্জার এ বারুণী হয়ে নেপালে যায়।

ষ্টেশানে দেখলুম Refreshment room রয়েছে। দুধ ও খাবার বেশ সস্তা। বারুণীকে বিদায় দিয়ে বেলা দশটা আন্দাজ সমস্তিপুরে পৌছলুম।

এখান থেকে রক্সোল যাবার দুটো পথ। প্রথম সমস্তিপুর থেকে মজাফরপুর, মতিহারি দিয়ে সিগোলী এবং সেখান থেকে ট্রেণ বদল করে রক্সোল। দ্বিতীয়টী দ্বারভাঙ্গা, জনকপুর, সীতামারীর মধ্যে দিয়ে বৈরাগনিয়া এবং সেখান থেকে অন্য ট্রেণে রক্সোল। দ্বারভাঙ্গার আগের ষ্টেসন লাহেরিয়াসরাই। সেখানে বন্ধুটীর ভগ্নীপতি থাকেন। কিছুকালের জন্য তাঁদের বাড়ীতে হল্ট্ করে যাব বলে দ্বারভাঙ্গার ট্রেণে চড়ে বসলুম।

সমস্তিপুর ছাড়াতে দুপাশে ভূমিকম্পের চিহ্ন দেখা যেতে লাগলো। লাইনের দুধারে প্রকৃতির উন্মত্ত খেয়ালের ইতিহাস—ইটকাটের স্তূপ জানিয়ে দিল কত গৃহহীনের

কথা। বেলা প্রায় বারটার সময় আমরা লাহেরিয়া সরাইতে পৌছলাম।

খেয়েদেয়ে বেশ এক ঘুম দিয়ে উঠে দেখি বেলা পাচটা। ট্রেণ সেই রাত ৮টায়। সুতরাং সহরটাকে বেশ একটু ঘুরে ফিরে দেখে নিতে বেরুলুম। ফিরে এসে দেখি, সুধীরদার ভগ্নীপতি সুশীলবাবু লোটাকম্বল বাঁধছেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে বল্লেন—তাঁর অনেক দিন ধরে সংসারে বৈরাগ্য এসেছে এবং সেই বৈরাগ্যের antidote হিসাবে তিনি সাত দিনের জন্য সন্ন্যাসী হতে প্রস্তুত। সানন্দে তাঁকে দলে ভিড়িয়ে নিলুম। দুয়ে একে তিন হয়ে যাত্রা আরম্ভ করা গেল। অবশ্য admission fee হিসাবে লুচি, সন্দেশ ভর্ত্তি একটা হাঁড়ি নিয়ে। দাদাটী তাঁর গামছা দিয়ে হাঁড়িটাকে বেশ ভাল করে বেঁধে নিলেন।

রাত ৮টার ট্রেনে উঠে পড়া গেল। গাড়ী একেবারে খালি প্রায় ৬৭ মাইল অর্থাৎ বৈইরাগনিয়ার আগে, আর গাড়ী বদল করতে হবে না বলে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। দুধারে খোলা মাঠ। তার উপর দিয়ে ট্রেন চলেছে। কন্ কনে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে দাঁতে দাঁতে ঠক্‌ঠকি লাগিয়ে দিচ্ছে।

ঘুমবার বৃথা চেষ্টা ত্যাগ করে উঠে বসলাম। লাইনের ধারে ধারে ঝাঁকড়া মাথা গাছগুলো আব্ছায়া অন্ধকারে রূপকথার দৈত্যের মতন যেন ছুটছে। একটা গাছে কি যেন একটা পাখীর বাসা ছিল। আমাদের গাড়ী দানবের মতন গর্জ্জন করে তার পাশ দিয়ে যেতেই পাখীর ছানা গুলো অসহায় শিশুর মত ভয় পেয়ে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লো।

রাত একটায় বাইরাগনিয়ায় পৌছলাম। এখান থেকে গাড়ী আবার ফিরে সমস্তিপুরে চলে যাবে। পাশেই 'রক্‌সোলের' গাড়ী। আমরা তাতে চড়ে পড়লুম। রাত দুটোর সময়ে আমাদের গাড়ী দীর্ঘ বিশ্রামের পর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে রক্‌সোলের দিকে চল্ল। পথে ষ্টেশনের নাম গুলো—ঘোড়া-চানা, চৌরদানো প্রভৃতি বেশ উপ-ভোগ্য। ভোর-রাত্রে আমরা রক্‌সোলে এসে পৌছলুম। ট্রেণ আমাদের রক্‌সোলে নামিয়ে দিয়ে 'নাক্‌ কাটিমার' (Narktigunj) দেশে চলে গেল।

* * * * * *

চারি দিকে গাঢ় অন্ধকার। গোটা দুই কেরোসিনের ল্যাম্প ষ্টেশনের অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে। এখন আমাদের

নেপালের রেলে উঠ্‌তে হবে। কিন্তু প্রধান সমস্যা, ষ্টেশান খুঁজে বার করা। এদিক, ওদিক ঘুরতে ঘুরতে দেখি ‘তার-বাবু’ গভীর মনোনিবেশ সহকারে ‘টরে টক্কা’ করছেন। তাঁকে সেলাম জানিয়ে নেপালের ষ্টেশান কোন দিকে জিজ্ঞাসা করলুম। ভদ্রলোক ঘাড় না তুলেই উত্তর দিলেন ‘সোজা চলে যান’। গতিক সুবিধার নয় ভেবে ফিরে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় দেখি, দাদাটি খুব আগ্রহ সহকারে ট্রেণ কখন ছাড়বে প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু ভদ্রলোক এমন ভাবে মুখ তুলে চাহিলেন যে তাতে মনে হলো যে নেপালের মতন ক্ষুদ্র রাজ্যের রেলের কথা জিজ্ঞাসা করায় তাঁকে রীতিমত অপমান করা হয়েছে। ইসারায় দাদাকে বল্লাম চলে আস্‌তে। তিন জনে ঠিক্ করলুম রাতটা waiting roomএ কাটিয়ে সকালে খোঁজ করা যাবে। Waiting roomএর দিকে এগোচ্ছি এমন সময়ে একজন সেলাম করে জানালো যে বক্‌শিস্ পেলে সে আমাদের মুস্কিল আসান করে দিতে পারে। মুস্কিল-আসান আমাদের সাই-ডিং এর goods-train এর তলা দিয়ে, ফুলবাগানের মধ্য দিয়ে, খোলা মাঠের ওপরদিয়ে

প্রায় মিনিট দশেক হাঁটিয়ে নেপাল মহারাজার মুসাফির খানায় এনে হাজির করলো। সেখানে থাকতে রাজি না হওয়ায় সোজা বরাবর ষ্টেশানে নিয়ে গেল।

নেপালের ষ্টেশানটি খুব ছোট। দুটো ছোট ছোট ঘর। একটিতে টিম্ টিম্ করে আলো জ্বলছে। একজন নেপালী ভদ্রলোক বসে কাজ করছিলেন। শুনলাম বেলা ৮টায় ট্রেণ। মুস্কিল-আসানকে খুসী করে জিনিষ পত্র নিয়ে ষ্টেশানের এক বেঞ্চে বসা গেল।

বুধবার ১৯শে ফেব্রুয়ারী

রাত্রের জমাট অন্ধকার ক্রমে ফিকে হয়ে আসছে। দূরে শুকতারাটা তখনও দপ্‌ দপ্‌ করছে। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বেড়ে উঠছে বাস্তবতার কোলাহল। ঘুমন্ত ধরণী যেন সোনার কাঠির স্পর্শে জেগে উঠ্‌লো। মাঠের মাঝখানে ছোট্ট ষ্টেশান, আর আমরা তিনটী যাত্রী। সুশীলবাবুকে জিনিষের পাহারায় রেখে আমরা মুখ ধোয়ার জন্য জলের উদ্দেশ্যে চল্লাম।

ষ্টেশানের পিছনে একটী কূয়া পাওয়া গেল। কিন্তু জল ভাল নয়। নিকটে জল না পাওয়ায় সেখানে মুখ ধোয়া শেষ করা গেল। মুখ ধুয়ে ফিরে আস্‌ছি এমন সময় একজন নেপালীর কাছে শুনা গেল, নিকটে একটা চালের কলে Tube-well আছে। দুই বন্ধুতে 'ফ্লাস্ক্‌' নিয়ে জলের খোঁজে ছুট্‌লাম। ফিরে এসে দেখি সুশীলবাবু এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়েছেন। তিনি এখানকার Station

staff এর একজন। বাঙ্গালীকে এতদূরে স্বাধীন রাজার রাজ্যে কাজ করতে দেখে বেশ আনন্দ হলো। তিন জনে পথ সম্বন্ধে সমান পণ্ডিত। সুতরাং তাঁকে পথের কথাই বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম। ভদ্রলোক বেশ অমায়িক। প্রাণ খুলে তিনি আমাদের সকল কথারই উত্তর দিতে লাগ্‌লেন।

শিবরাত্রির সাতদিন আগে থেকে যে কোন হিন্দুকে পাশ দেওয়া হয়। কিন্তু সকলকে শিবরাত্রির পরের সাত-দিনের মধ্যে ফিরতেই হবে। শিবরাত্রের মেলার জন্য রেলের ভাড়াও অর্দ্ধেক হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর ।৶১০ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ১৶। টে্রণে আমাদের ২৪ মাইল দূরে আমলেখগঞ্জে যেতে হবে। সেখান থেকে বাসে আরও ২৪ মাইল ভীমপেড়ী। তারপর পায়ে হেঁটে তিনটী পাহাড় ডিঙ্গিয়ে 'থানকোট'। সেখান থেকে আবার দশ মাইল মটরে গিয়ে, তবে পশুপতিনাথের দর্শন মিল্‌বে। যাত্রীদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই বেশী। ভীমপেড়ীতে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। সেইজন্য যাত্রীরা এখনও নেপালের দিকে এগোতে পারেনি। বৃষ্টি হচ্ছে শুনে মনটা দমে গেল। সঙ্গে একটা

ছাতা ও একটা water proof (বর্ষাতি) সম্বল, অথচ আমরা তিনটী প্রাণী। তখনও জান্‌তাম না যে রাত্রের অন্ধকারে মুস্কিল-আসানের সঙ্গে সঙ্গে সুধীরদা'র ছাতাটিও অন্তর্দ্ধান হয়েছে।

নেপালের রক্‌সোল ষ্টেশান্‌ যে জায়গায় আছে তা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে lease নেওয়া। প্রায় আধ মাইল টাক দূরে একটা নদী আছে। তার একধারে বৃটিশ রাজত্ব শেষ হয়েছে এবং অপর দিকে নেপালের স্বাধীন রাজ্য।

দু'এক জন করে লোকের আমদানি হতে লাগ্‌লো। টিকেটের ঘণ্টা পড়লো। অথচ পাশ-পোর্ট অফিসারের দেখা নেই। আবার বাঙ্গালী ভদ্রলোকের শরণাপন্ন হওয়া গেল। তিনি আশ্বাস দিয়ে বল্লেন,—"আমি পাশ-পোর্ট অফিসারকে খবর দিচ্ছি।"

একটু পরে Pass-Port অফিসার এলেন। একখানা এক ইঞ্চি স্কোয়ার ছাপ মারা কাগজ প্রত্যেককে দেওয়া হলো; মেয়েদের কাগজে 'জেনানা' এবং ছেলেদের কাগজে 'লেড়কা' লেখা। নাম, ধাম, বা কোথা হতে আগমন এ সবের কিছু হাঙ্গামা দেখলাম না।

'ইষ্টি কবচের' মত কাগজগুলিকে সাবধানে রাখা গেল। এন্‌জিনের নাম 'মহাবীর'। গায়ে মহাবীরের ছবিও খোদাই-করা আছে। লাইন মিটার গেজ। বেলা ৮টায় ট্রেণ ছাড়ল। নদী পার হয়ে ট্রেণ বীরগঞ্জে এসে থামল। বীরগঞ্জ ব্যবসা বাণিজ্যের একটা প্রধান কেন্দ্র। জেল, ডাক্তারখানা এবং ভাল ধর্ম্মশালা এখানে আছে। শুনলুম অনেক মাড়োয়ারীও এখানে ব্যবসা উপলক্ষে বাস করছে। এখানে সাঁকালু ও কুল কেনা হ'ল; কিন্তু সাঁকালু সেরকম মিষ্টি নয়।

বীরগঞ্জ পার হ'য়ে দু'দিকে প্রসারিত মাঠ। তার উপর দিয়ে ট্রেণ চলেছে। কোনখানে উঁচু নীচু নেই—যেন বাংলা দেশের মধ্যে দিয়েই চলেছি। দূরে অস্পষ্ট গিরি-রাজকে মেঘের মতন দেখা যাচ্ছে। ষোল মাইল অতিক্রম করবার পর ট্রেণ আমাদের শাল এবং নানা জাতীয় গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে চল্ল। প্রায় আরও চার মাইল বন পার হয়ে ধীরে ধীরে গাড়ী পাহাড়ে উঠ্‌তে লাগল। বেলা ১১টা আন্দাজ, আমরা আমলেখগঞ্জে পৌঁছলাম।

ষ্টেশানটী বড় সুন্দর। চারিদিকে উচু পাহাড়। তার মধ্যে ষ্টেশান। যাত্রীদের থাকার জন্য ধর্ম্মশালা আছে নল দিয়ে ঝরণার জল একটী বড় চৌবাচ্চায় জমা করা হচ্ছে। সেখান থেকে সেইজল সহরে সরবরাহ করা হয়। এখানে বেশ ভাল খাবারও পাওয়া যায়। দুই একজন হিন্দু-স্থানী হালুই-করের দোকানও আছে।

এবার বাস বা লরীতে চব্বিশ মাইল যেতে হবে। আগে যে সমস্ত লরী কাঠ বইবার জন্য ব্যবহার হ'ত, এখন সেগুলো সব যাত্রী বইবার জন্য ষ্টেশানে হাজির। দুই একটার উপরে ত্রিপলের একটা আচ্ছাদন দেওয়া হয়েছে মাত্র।

ড্রাইভারের পাশে বসে গেলে পাঁচসিকা করে ভাড়া দিতে হবে। ভিতরে এক টাকা। সুশীলবাবু একটায় এবং আমরা দু'জনে আর একটায় উঠে বসলাম। ইতিমধ্যে জলযোগ সাঙ্গ করা গিয়াছে।

*　　*　　*

প্রায় সাড়ে বারটায় লরী ছাড়লো। হিমালয়ের বুকের উপর দিয়ে মটর ছুটছে। কোথাও নামছে আবার কোথাও দার্জ্জিলিংএর মত চক্রাকারে

পাহাড়কে চক্র দিতে দিতে উপরে উঠ্‌ছে। কোনখানে গিরি-রাজের কোন কর্ম্মচারী জলদ গম্ভীরভাবে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষুদ্র লরীখানা নিকটে যাওয়া মাত্র একটু মুচ্‌কে হেসে পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

নীল আকাশের মেঘগুলি মাঝে মাঝে উপরে উঠ্‌বার Pass-Port না পেয়ে রক্ষীদের বুকে মাথা রেখে কাঁদছে। কোথাও আবার বৃষ্টির জল গিরি-রাজের উপর অভিমান করে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ছে। তন্ময় হয়ে চারিদিকে দেখতে দেখতে চলেছি। মনে হ'ল এই স্বর্গ। এরাই মানুষ। আমরা তুলোর জামা পরা বাক্সবন্দী আঙ্গুর!

হঠাৎ মটর ঘ্যাস্‌ করে থামল। সামনে দেখি এক পাহাড় পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে। পাহাড়ের মাঝখানে একটা বড় কাঠের দরজা। এক নেপালী বীরপুরুষ সেই দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন।

পাহাড়ের গায়ে 'চুড়িয়া' দেবীর মন্দির ও টোল অফিস। পাশেই পাহাড় ভেদ করে টানেলের পথ। টোল অফিসে টাকা জমা দেওয়াতে টানেলে প্রবেশ করবার ছাড়-পত্র পাওয়া গেল। দেবী দর্শন করে, টানেলে আমরা প্রবেশ

করলুম। টানেলটী খুব সরু ও প্রায় আধ মাইল লম্বা। একখানা মটর মাত্র যেতে পারে। বড় বড় শাল-কাঠের গুঁড়ি টানেলের পিলারের কাজ করছে। হেড-লাইট্ জ্বেলে হর্ণ দিতে দিতে মটর আমাদের টানেল পার করে দিল।

এঁকা বেঁকা সরু পথে মটর আবার চলা স্বুরু করেছে। একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে গভীর খাদ। দু'খানা মটর অতি কষ্টে পাশাপাশি যেতে পারে। একটা বড় পার্ব্বত্য নদীর পুল পার হয়ে আমাদের মটর 'তরায়ের' প্রসিদ্ধ জঙ্গলে প্রবেশ করলো।

দুধারে ঘন জঙ্গল। তার ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি। শুনেছি এখানে নানা বন্য জন্তু আছে। শিকারের জন্য নেপালের মহারাজা এখন এখানে এসে তাঁবু ফেলেছেন।

বন পার হয়ে গ্রাম। এখানে অনেক লোকের বাস। পথের ধারে ধারে দোকান রয়েছে। বৃদ্ধেরা বেশ আরামে তামাক টান্‌ছে আর কৌতূহলপূর্ণ চোখে নবাগতদের দেখ্‌ছে।

গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে বেলা তিনটার সময় আমরা ভীমপেড়ী বা ভীমফেরীতে পৌঁছলাম। এখান থেকে এবার পায়ে হাঁটা পথের সুরু।

*　　*　　*

লরী থেকে নামতে না নামতে কুলি ডাণ্ডি-বাহক ও Custom officerরা ঘিরে দাঁড়াল। সুটকেশ প্রভৃতি খুলে কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য আছে কিনা তার অনুসন্ধান কর্‌তে লাগল। কিছু না পাওয়াতে এ যাত্রা পরিত্রাণ পাওয়া গেল। সুশীলবাবু আমাদের আগে এসে কুলি-পর্ব্ব শেষ করে রেখেছেন।

দু'রকমের ডাণ্ডি দেখলুম। ইন্‌ভ্যালিড্-চেয়ারের মত এক রকম, আর এক রকম ক্যাম্বিসের দোলার মতন। খানকোট্ অবধি ভাড়া বার টাকা। ছ'জন কুলি সাধারণতঃ ডাণ্ডি বহে নিয়ে যায়। আবার কেউ কেউ দেখলুম কুলিদের মাল বহিবার বেতের ঝোলায় বসে দিব্বি চলেছে।

গুটি-তিনেক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোককে সঙ্গী পাওয়া গেল। তাঁদের মধ্যে একজন নেপালে অনেকবার গিয়াছেন এবং পথ ঘাট সমস্ত তাঁর কণ্ঠস্থ। তাঁদের নিয়ে আমাদের

দল ভারী করা গেল। আমরা সব হেঁটে চল্লুম। কুলি আমাদের মাল-পত্র তার বেতের ঝোলায় নিয়ে কপালের উপর থেকে একটা চামড়ায় ঝুলিয়ে পিছন পিছন আসতে লাগল।

যাত্রীরা হাতছাড়া হয়ে যায় দেখে জনকতক দোকানদার রাত্রিটা ভীমফেরীতে থাকতে উপদেশ দিল। তাঁদের কাছে শুনলুম পাহাড়ের উপরে উঠলেই নাকি সন্ধ্যা হয়ে আসবে এবং আশ্রয়ের অভাবে পথে বড় কষ্ট পেতে হবে। ট্রেণ এবং বাসে এতদূর আসাতে শরীরটাও বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সামনে প্রকাণ্ড পাহাড়। এই ক্লান্ত শরীর নিয়ে উপরে উঠতে পারব বলে মনে হয় না। অতএব রাতটা এখানকার ধর্ম্মশালায় অথবা কোন দোকানে কাটালেই ভাল হয়। কিন্তু সঙ্গী যাত্রীদল থাকতে নারাজ। কারণ ভীমপেড়ীতে রাত্রি কাটালে পশুপতিনাথে পৌঁছতে শুক্রবার বিকেল হবে। শুক্রবারে শিবরাত্রি। ঐদিন বিশেষ উৎসব। অগত্যা সকলে যাওয়াই ঠিক করলাম।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বাজারে ছাতা কিনতে গিয়ে

বিফল হয়ে ফিরে এলাম। অগত্যা হারানো ছাতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে করতে এগিয়ে চল্লাম।

সামনেই গগনস্পর্শী শিশাগড়ী পাহাড়। প্রায় আট হাজার ফুট উচু। এর উপর আমাদের উঠ্তে হবে।

পাহাড়ের ধারেই ক্যাম্প। কুলি আমাদের জিনিষপত্র নিয়ে সেই ক্যাম্পে ঢুকে পড়লো। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে জানলাম এটা কুলি রেজিষ্টারী অফিস। পাহাড়ের রাস্তায় কুলি জিনিষ পত্র নিয়ে যাতে চম্পট না দেয় তার জন্য নেপাল গবর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থা। এখানে প্রতি মণ জিনিষের জন্য তিন টাকা জমা দিতে হয়। টাকা জমা দিলে কুলি ও মালিকের নাম লেখা একখানা কাগজ দিয়ে দেয়। পথে মাঝে মাঝে ঘাঁটি আছে। সেখানে এই কাগজ দেখাতে হবে নতুবা কুলিকে যেতে দেবে না।

কুলি রেজিষ্টারী করে দেখি অফিসে নেপালী পয়সা, আনি প্রভৃতি সাজান রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম আমাদের টাকা পয়সা নেপালে চলবে কি না। অফিস থেকে ভরসা পেলাম, যে চলবে।

*   *   *   *

বেলা চারটায় পাহাড়ে উঠ্‌তে আরম্ভ করা গেল। পথ কতকটা 'পরেশনাথ' পাহাড়ের পথের মতন। অল্প অল্প খাড়াই হয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে টার্ণ নিয়ে আবার ক্রমে ঢালু থেকে উঁচু হতে আরম্ভ হয়েছে। কোথাও কোথাও ভীষণ চড়াই ও উৎরই। পথের চারিদিকে বড় বড় পাথর ছড়ান। খানিকটা বস্‌ছি আবার খানিকটা হাঁট্‌ছি। এমনি করে একটা ঝরণার ধারে এসে উপস্থিত হলুম।

ঝরণার ধারে কয়েকটা ছোট ছোট খাবারের দোকান রয়েছে। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, দোকান থেকে মকাই কিনে ছ'পকেট ভর্ত্তি করে আবার যাত্রা করা গেল।

সন্ধ্যা ছটায় শিশাগড়ীর ধর্ম্মশালায় পৌঁছলুম। এসে দেখি ধর্ম্মশালা সেদিনকার মত কোন এক বিশিষ্ট রাজ-পুরুষের অশ্বশালায় রূপান্তরিত হয়েছে। ছ'একটা দোকান যাও আছে তা আগে থেকেই যাত্রীতে ভরে গেছে। এর উপর Custom Officer ও সঙ্গীন কাঁধে নেপালী সৈন্যদের হাঙ্গামা!

তন্ন তন্ন করে আমাদের জিনিষ পত্র ওলট-পালট করা হলো। কুলির রসিদ দেখে, তাতে একটা করে সই দিয়ে

ফিরত দেওয়া হলো। 'Pass-Port'গুলি বদল করে, আবার সেই রকম তিনখানা কাগজ আমরা পেলুম।

থাকার স্থানাভাবে সকলে পরামর্শ দিল যে পাহাড়ের তলায় 'কুলে-খালি' বলে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে। সেখানে বড় ধর্ম্মশালা ও থাকবার আস্তানা পাওয়া যাবে। অল্প একটু চড়াই উঠেই নামতে হবে, সুতরাং বেশী কষ্ট হবার আশঙ্কা নেই।

অগত্যা সকলের কথামত আবার যাত্রা সুরু করলুম। ক্ষিদেটা আমার একটু বেশী বলেই প্রবাদ। কাজেই 'বয়লারের কয়লা' অর্থাৎ দ্বারভাঙ্গার খাবারের হাঁড়ী বরাবর আমার হাতেই ছিল। কিন্তু মিনিট পাঁচেক চল্‌বার পর হঠাৎ মনে হলো—যা! হাঁড়ী তো Custom officeএ ফেলে এসেছি। দাদা বল্লেন—থাক্‌গে। আমার মন কিন্তু তাতে রাজি হলো না। সকলকে একটু দাঁড়াতে বলে এক ছুট দিলুম। এদিক ওদিক খুঁজে এলুম, কিন্তু কোথাও আর আমার 'বাঞ্ছাকল্প তরু' হাঁড়ীর সন্ধান মিললো না।

মনের দুঃখ মনে নিয়েই ফিরে এলুম। আস্‌তে দাদা

বল্লে, গেছে কি আর করা যাবে, চল। কিন্তু মনে আমার কী যে দুঃখ, তা দাদা কী আর বুঝবে? বল্লুম, তুমি তো চারটি মকাই চিবিয়েই দিন কাটিয়ে দিতে পার, কিন্তু আমার অবস্থা!

* * * তুমিতো জান না
(এ) পেটের ভাবনা
চলিতে চলিতে পথে
খাবার মিলিবে না।

* * * *

আশা ছিল একটু উঠেই নাম্‌তে হবে। কিন্তু যতই উঠি, উঠার যেন আর শেষ হয় না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সূর্য্য অস্ত গেল। কাল ছায়া ধীরে ধীরে গাছের উপর দিয়ে নাম্‌তে নাম্‌তে যেন বল্‌ছে—পথিক, থাম! কিন্তু থামবার অবসর কই?

পথের ক্লান্তিতে সকলের মুখের কথা প্রায় একরকম বন্ধ। খানিকটা চলার পর দেখি দূরে গেরুয়া-পরা এক নারী-মূর্ত্তি, মাথায় একটা পোঁটলা নিয়ে চলেছেন। আমাদের পিছনে দেখে ক্লান্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"বাবা, কুলেখানি আর

কতদূর।" আশ্বাস্ দিয়ে বল্লাম 'আর বেশী দূর নেই।' খালি হাতে চল্‌তে তাঁর কষ্ট হচ্ছে দেখে আমাদের থেকে একটা লাঠি তাঁকে দিলুম। খুব খুসী হয়ে আমাদের আশীর্ব্বাদ করতে করতে তিনি তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনাতে লাগ্‌লেন। যশোর থেকে তিনি আসছেন। তাঁর সঙ্গী পথে বসন্তে মারা গিয়েছেন। তাঁর কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমরা পাহাড়ের মাথায় পৌঁছলাম। এখানকার উচ্চতা প্রায় আট হাজার ফুট।

এইবার নামবার পালা। পথ সোজা নেমে গিয়েছে। চারিদিকে এলোমেলো টুক্‌রো টুক্‌রো পাথর ছড়ান। অতি সাবধানে নাম্‌তে লাগলুম। একটু একটু করে মনে আশা হচ্ছে যে এইবার বোধ হয় পথের শেষ হবে। সাম্‌নে এগিয়ে দেখি, পিঁপ্‌ড়ের সারির মতন প্রায় জন চল্লিশেক যাত্রী আমাদের মতন চলেছে। গভীর অন্ধকার হয়ে গেছে। অথচ আলোর সংখ্যা খুবই কম। বিরাট যাত্রীদল যেন পাতালের দিকে চলেছে।

আগে আগে সুশীলবাবু টর্চ্চ হাতে পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন আর তাঁর পিছনে আমরা এক দল চলেছি। ঘণ্টার

পর ঘণ্টা চলে যাচ্ছে। আমরা চলেছি ত' চলেছি! সকলের মুখে এক কথা—আর কতদূর?

সুশীলবাবু হঠাৎ পা স্লিপ্ করে পড়লেন। রাত্রে পথের মাঝে আকস্মিক বিপদে আমরা হতভম্ব হয়ে গেলুম; —উপায়! সুশীলবাবু কোন রকমে লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অতিকষ্টে চলতে লাগলেন। প্রায় রাত ন'টায় আমরা কুলেখালিতে পৌঁছলুম।

অনেক কষ্টে একখানা ঘরের আধখানা আট আনা ভাড়ায় ঠিক করা গেল। একদিকে দু'টি কলিকাতা-প্রবাসী নেপালী আর অপর দিকে আমরা তিনটী বাঙ্গালী। তাড়াতাড়ি রান্নার আয়োজন করা হলো। সাম্‌নেতে একটুখানি রক; সেইখানে কাঠের উনান অতি কষ্টে জ্বালান গেল। পাহাড়ের ঠাণ্ডা হাওয়া ওভার-কোট ভেদ করে রক্ত জমিয়ে দিচ্ছে। সুধীরদা' তাড়াতাড়ি বিছানা করে সুশীলবাবুর শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর পা বেশ ফুলে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর। বন্ধুটী তাঁর পায়ে ঔষধ মালিস করতে বসলেন। আধ ঘণ্টা পরে খিচুড়ি নামিয়ে গিয়ে কে যে রোগী আর কে যে 'Nurse-

man' তা' ঠিক করে উঠ্‌তে পারলুম না। দাদাটী দেখি সুশীলবাবুর গায়ের উপর পড়েই বেশ নিদ্রা দিচ্ছেন।

আহারাদি সম্পন্ন করে, গরম জলে মুখ ধুয়ে একেবারে কম্বলের তলায়। সুশীলবাবুর গায়ে হাত দিয়ে মনে হ'ল জ্বর বেশ! অতটা রাস্তা হেঁটে আমাদেরও শরীর কাহিল। নেপালী ভায়াদের কাছে শুনলুম নিকটে কোন ডাক্তার নাই। ডাক্তার এক ভীমফেরীতে পাওয়া যাবে, নতুবা কাটামুণ্ডুর আগে আর কোন উপায় নেই। মহা ভাবনায় পড়া গেল। একে অজানা দেশ, তার উপর নিকটে কোন ডাক্তার পাওয়া যাবে না শুনে কী যে করবো আমরা কিছুই ঠিক করতে পারলুম না। আমাদের বিশেষভাবে চিন্তিত দেখে সুশীলবাবু আশ্বাস্ দিয়ে বল্লেন—'কিছু ভয় নেই, জ্বর শীঘ্র কমে যাবে।' ভাবনা থেকে পথের ক্লান্তির প্রভাব বেশী হ'লো। হাজার চেষ্টা করেও আমরা কেহই জেগে থাকতে পারলুম না।

বৃহস্পতিবার ২০শে ফেব্রুয়ারী

'কোঁকর কোঁ'

চোখ্ মেলে দেখি ঘরের এক কোনে একটা ঝুড়ি চাপা কতকগুলি মোরগ সমস্বরে ভৈরবী জুড়ে দিয়েছে। কাল রাতের অন্ধকারে এগুলি নজরে আসেনি।

পাশের নেপালী দুটী তল্পী-তল্পা বাঁধতে সুরু করে দিয়েছে। সুশীলবাবুকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেমন আছেন?'

তিনি বল্লেন, জ্বর নেই, তবে ভয়ানক শীত, রোদ না উঠলে, উঠতে পারবো না। অগত্যা পাশ ফিরে আবার কম্বলখানা মাথা পর্য্যন্ত টেনে দিলুম।

একটু পরে দেখি ঘরের ভিতর একটু একটু আলো আসছে। আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাহিরে এলুম।

সামনেই এক বিরাট পাহাড়। ক্ষুদ্র এক ঝরণা কুল কুল করে তার গা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র শিশু যেমন তার দু'পাশের বালিশের গণ্ডী তার ছোট ছোট দু'খানা হাত দিয়ে

অপসারিত করবার বিফল চেষ্টা করে, তেমনি নদীর অসহায় জলকণাগুলি নিরুপায় শিশুর মতন টুকরো টুকরো পাথরের বাধাকে সরাতে না পেরে অভিমানে ফুলে, ফেঁপে তার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।

নির্ব্বাক হয়ে এ দৃশ্য দেখ্‌ছিলুম। হঠাৎ চমক ভাঙলো একেবারে ঝরণার ধারে গিয়ে। এক পা, এক পা করে কখন যে ক্ষুদ্র স্রোতটীর ধারে এসে পড়েছি, তার খেয়ালই নেই। পাথরে ধাক্কা খেয়ে জলকণাগুলি অজস্র বুদ্বুদের সৃষ্টি করছে। তার উপর সকালের নরম সূর্য্য-কিরণ পড়ে নানা রঙ্‌এর আভাষ দিচ্ছে।

দারুণ লোভ হলো সেই নৃত্য-চপল হাস্যময়ী ছোটছোট ঢেউগুলোকে হাতের মুঠোয় ধরতে। হাত বাড়িয়ে সেগুলিকে মুঠোর মধ্যে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলুম। একটু পরেই দেখি হাত অবশ। ঢেউগুলো যেন আমার অবস্থা দেখে হাস্‌তে হাস্‌তে বলে গেল—'মাটির মানুষ! কৃত্রিম জগতে বাস করে কোন্ সাহসে আমাদের পবিত্রতা নষ্ট করতে চাও!'—

চায়ের নেশা সৌন্দর্য্যের নেশাকে ছাপিয়ে উঠ্‌লো। আমাদের আস্তানায় ফিরে এসে দেখি, দাদা একটা

লিলিপুটিয়ান ষ্টোভ কোথা থেকে বার করে তাতে চায়ের জল চাপিয়েছেন। সুশীলবাবুকে 'থানকোট' পর্য্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য চার টাকায় একটা ডাণ্ডি ঠিক করে সবে চা খাচ্ছি এমন সময়ে এক অভাবনীয় ব্যাপার। আমাদের হারানো-রতন 'হাঁড়ী' এক কুলি মারফৎ এসে হাজির। জিজ্ঞাসা করে জানলুম শিশাগড়ীর পুলিশ পাঠিয়ে দিয়েছে। হাঁড়ীর সঙ্গে সঙ্গে মনে এল সাহস; নব উৎসাহে আমরা আবার রওনা হলুম।

* * *

কুলেখালি থেকে চন্দ্রাগড়ি পর্য্যন্ত যে রাস্তা সেটা ঠিক্ পাহাড় নয় আবার তাকে সমতল ভূমিও বলা চলেনা। রাত্রে বরফ পড়ায় পথ একটু পিচ্ছিল। আমরা সেই আঁকা বাঁকা পিচ্ছিল পথ ধরে এগিয়ে চল্লুম। যতই এগোই ততই একটা জলোচ্ছ্বাসের শব্দ কানে আসতে লাগ্‌লো। না দেখা জিনিষ দেখবার কৌতূহল মনটাকে টানতে লাগল; সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল চলার দ্রুততা।

খানিকক্ষণ হাঁটার পর আমরা একটা পুলের কাছে এসে পড়লুম। তার নীচে দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল এক পার্ব্বত্যনদী

উদ্দাম ভাবে ছুটে চলেছে। গভীর আবর্ত্তনে জাগছে উন্মাদ গর্জ্জন, নির্ম্মম পাহাড়ে ধ্বনিত হচ্ছে তার বিপুল প্রাণ-শক্তি। পরিপূর্ণ যৌবনের আবেগে সমস্ত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে সে চলেছে।

ঝোলান পুলের উপর দাঁড়িয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌লো আর একখানা ছবি—শান্ত, ধীর ভাবে বহে যাওয়া বাংলা দেশের নদীর কথা। তাতে নেই যৌবনের দু'রন্ত আবেগ, নেই বাধা বিপত্তির বৈচিত্র্যতা। কেবল অতীত জীবনের স্মৃতি মাঝে মাঝে তার সুপ্তমনে আনে বিদ্রোহের ছোঁয়াচ, বার্দ্ধক্যের দিনে তাই মাঝে মাঝে দু'কুল ভেঙ্গে সে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। কিন্তু সে সামান্য দিনের জন্য; তার পর আবার সেই স্থির জলপ্রবাহ, একঘেয়ে কেরাণী জীবনের মতই।

পথিকের পথের মাঝে বিলম্ব করবার অবসর নেই। আবার চলতে সুরু করলুম। সামনে পিছনে যাত্রীর সারি। উঁচু পাহাড়টা মনে ভয় ধরিয়ে দেয়, আবার লোভ দেখায় তার অফুরন্ত বৈচিত্র্যতা দেখিয়ে।

কখনও আমি আগে, দাদাটী পিছনে, কখনও দাদা

আগে, আমি পিছনে, এমনি ভাবে চলেছি। কোথাও বা দু'জনে এক সঙ্গে। মাঝে মাঝে পথ এত নিস্তব্ধ, যে মনে হয় সমস্ত প্রকৃতি যেন ধ্যান-মগ্না। দূরে নেপালী কৃষকদের কুটীর গুলি বাবুই পাখীর বাসার মত দেখা যাচ্ছে। কোথাও পাহাড়ের উপর গরু মোষ চরাচ্ছে একদল লোক, ঠিক যেন পুতুলের মতন।

কোথাও আকাশ নীল—গাঢ় নীল; আবার কোথাও টুকরো টুকরো মেঘ নানা জীব-জন্তুর আকার নিয়ে সেই অসীম নীল আকাশের বুকের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে—কোন্ বিরহীর বার্ত্তা নিয়ে।

সহসা মনে এসে যায় বালক-সুলভ চপলতা। মন ছুটে যেতেচায় সুতো ছেঁড়া ঘুড়ির মত, উদ্দেশ্য-বিহীন-ভাবে। কখনও ইচ্ছা করে সামনে উচু কাল পাথরখানায় বসে কাটিয়েদি সারাটী দিন। কী হবে পথ চলে? কিন্তু সাহস হয় না, মনের কথা কাউকে বল্‌তে। সাথীরা হয়তো বল্‌বে একে নেকামী, পাগলামী। মনের ব্যথা মনে নিয়েই এগিয়ে চলি।

চল্‌তে চল্‌তে দেখি, একটা রোপ-ওয়েতে জিনিষ পত্র

যাওয়া আসা করছে। পথ দুর্গম বলে পাহাড়ের উপর দিয়ে শক্ত তার টাঙিয়ে তাতে করে মাল-বোঝাই গাড়ীগুলিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—ইচ্ছা করে এমনি একটা বাক্সে বসে চারিদিকের প্রকৃতিকে একবার দেখেনি।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটায় চন্দ্রাগড়ি পাহাড়ের নীচে এসে পৌছলুম। আগে থেকে ঠিক্ ছিল এখানকার ধর্ম্মশালায় রান্না-খাওয়া সেরে নেব। কিন্তু রান্না-খাওয়া দূরে থাক, বসতেও ইচ্ছা হলো না। বাজারের দোকানগুলিও অপরিষ্কার। চোখবুজে কোন রকমে একটা দোকান থেকে পুরী কিনে তাই খেয়ে আবার যাত্রা সুরু করলাম।

*　　　*　　　*

সামনে একটু এগিয়ে চেয়ে দেখি এক বিরাট পাহাড়। তার বুক চিরে আঁকা বাঁকা পথটী উপরে উঠে গেছে। দূরে গ্যালিভার ট্রাভ্‌লের ছোট ছোট মানুষগুলির মত কতকগুলি লোক হামাগুড়ি দিয়ে তার উপর উঠ্‌ছে। পথের দিকে চাইলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে, উঠবার স্পৃহা থাকে না। পাহাড়টার নাম চন্দ্রাগড়ি। পাহাড় না পার হলে যখন আর আশ্রয় মিলবে না, তখন আর দেরী না করে

পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করা গেল। পথটা একেবারে নীরস। কোন রকম জলের চিহ্ন নেই কোথাও। পথের ধারে ধারে বড় বড় গাছের জঙ্গল। অনেক কষ্টে পথ চলে বেলা প্রায় একটার সময়ে আমরা চন্দ্রাগড়ির চূড়ায় এসে পৌঁছলুম।

এখানে পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় সাত হাজার ফুট। নেপালের রাজধানীতে যাবার এইটা হচ্ছে শেষ গণ্ডী। কোন রকমে একে পার হতে পারলে, একেবারে কাট্‌মণ্ডু। সামনেই দেখি এক নেপালী কমলা-লেবু বিক্রী করছে। কমলালেবু কেনা হল, কিন্তু বেজায় টক। জলতেষ্টায় ছাতি তখন ফাটছে, টকই তখন আমাদের কাছে অমৃত। পাহাড়ের উপর থেকে চারি পাশের দৃশ্য বড় মনোরম। রাত্রে অন্ধকারে হারানো হিন্দুস্থানী বন্ধুদের সঙ্গে এখানে দেখা হল।

একটুখানি বসে আবার নামতে সুরু করা গেল। নামবার দু'টো পথ। একটা বেশ ভাল। আর একটা পিচ্ছিল ও সোজা নেমে গেছে। কুলিদের Short Cut করতে দেখে আমরা তাদের পিছন পিছন চল্লুম। সুশীল বাবু ডাণ্ডীতে অপর পথ দিয়ে নামতে লাগলেন। আধঘণ্টা

নামবার পর দেখি ছ'টো পথ এক জায়গায় এসে মিলেছে ; এখান থেকে পথ ভাল। ভীমফেরীর পাহাড়ের রাস্তার মতন ঘুরে ফিরে নেমেছে।

একটা বিরাট অতিকায় শকুনের মত একখানা কাল মেঘ আকাশটাকে ছেয়ে ফেল্লে। আমরা জোরে জোরে চলতে লাগলুম। বহুদূরে থানকোটের ছ'একটা ঘর দেখা যাচ্ছে। আশা হলো যে শীঘ্র পৌছতে পারবো। এমন সময়ে তুষার পাত আরম্ভ হলো। সাদা সাদা পেঁজা তুলোর মতন বরফ কাল গরম কোটের উপর পড়ে তাকে সাদা করে তুল্ল। সকলে বল্লে এইবার বৃষ্টি নাম্বে। আমারা ছুটতে লাগলাম। থানকোটের একটা দোকানে পা দিয়েছি এমন সময় খুব জোরে জল এলো।

পাহাড়ে বৃষ্টির মজা এই যে যেমন দেখতে দেখতে আসে তেমনি দেখতে দেখতে থেমে যায়। খানিক পরেই বৃষ্টি থেমে গেল। দোকান থেকে প্রায় আধ মাইলটাক দূরে ট্যাক্‌সি ও লরীর আড্ডা। এখান থেকে মটরে আরো দশ মাইল গেলে পশুপতি-নাথের মন্দিরে পৌছন যাবে। পাঁচ টাকায় আমরা তিনজন ও আরও ছুইজন যাত্রী

মিলে একখানা ট্যাক্‌সি ঠিক করলুম। সমস্ত জিনিষ পেয়েছি বলে কুলির রসিদে সই করে দিয়ে, আমরা মটরে চেপে বসলুম।

উঁচু নীচু পথ দিয়ে মটর ছুটে চলেছে। চারি দিকের পাহাড় গুলি কখন দৌড়ে কাছে আসছে, আবার পরক্ষণে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। আকাশ মেঘলা। বিকেলেই মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। মাফ্‌লার দিয়ে কানটান ঢেকে বসে আছি। ড্রাইভার পথের পরিচয় দিতে দিতে চলেছে। অবশেষে মটর কাট্‌মণ্ডু সহরে এসে পৌঁছল।

* * * *

সামনে দেখি দার্জ্জিলিং এর লেবং এর ঘোড়-দৌড়ের মাঠের মতন প্রকাণ্ড মাঠ। সেখানে নেপালী-সৈন্যরা কুচ্‌কাওয়াজ করছে। একদল সৈন্য মার্চ করতে করতে আমাদের পথের উপর এসে পড়লো। ভাবলুম সৈন্যরা যতক্ষণ না যাবে ততক্ষণ আমাদের গাড়ী সেখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। কিন্তু স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার মূল্য কি তা তারা বেশ বোঝে। সৈন্যরা দু'ভাগ হয়ে মটরের পথ করে দিল।

মটর চালকের নিকট শুনা গেল যে কাল শিবরাত্রি উপলক্ষে বেলা দু'টায় এই ময়দানে কুচকাওয়াজ হবে, তারই রিহার্শাল এখন চলছে। কাট্-মণ্ডু থেকে পশুপতি-নাথের মন্দির প্রায় চার মাইল। আমরা বেলা পাঁচটা আন্দাজ পশুপতি-নাথে এসে পৌঁছলুম।

নৈপালের পথে
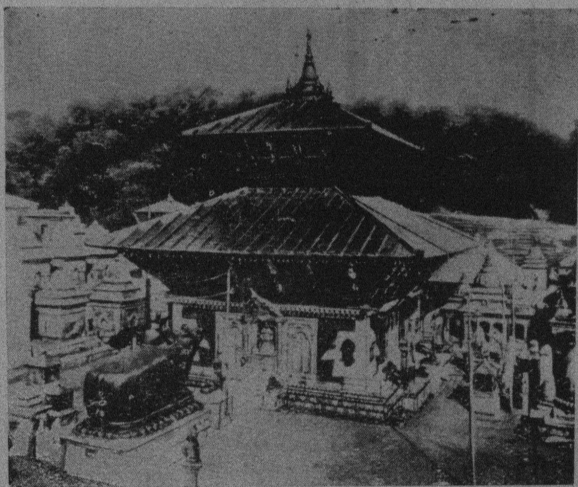
পশুপতিনাথের মন্দির।

নেপালের পথে

সুধীরদা'র কথা

রমেশ বড় মুস্কিলে ফেল্লে। কিছুতেই তার আর বাড়ী পছন্দ হয় না! কুলি ও জিনিষের ভার আমার উপর দিয়ে বন্ধু ভাল বাড়ীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। একা চুপ-চাপ্ দাড়িয়ে আছি। সামনেই পশুপতিনাথের মন্দির। যাত্রীরা সব কোলাহল করে দেব দর্শনে চলেছে। জানি না পশুপতি-নাথের কী আকর্ষণ, যার জন্যে মানুষ পাগল হয়ে তার শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহটাকে এ পর্য্যন্ত টেনে এনেছে।

মনে পড়ল, কালকের সেই শিশাগড়ী থেকে কুলেখালি যাওয়া। একে রাত্রি ঘোর অন্ধকার, তার উপর পথ পিচ্ছিল ও কঙ্করময়। প্রায় চল্লিশজন—বেশীর ভাগ বৃদ্ধা—সার দিয়ে সেই অন্ধকারের ভিতর অতি কষ্টে পথ করে চলেছে। সঙ্গের হ্যারিকেন দুটী অন্ধকারের গোলক-ধাঁধা সৃষ্টি করে পথিক-দের আরও বিভ্রান্ত করে তুলছে। পাহাড়ের কন্‌কনে হাওয়া যাত্রীদের বুকের হাড়গুলোকে পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে, তবুও তাদের চলার বিরাম নেই। কিন্তু কেন? কিসের আশায়? হয় তো এত কষ্টের পর মন্দিরে গিয়ে দেখবে

সেই একই শিব-লিঙ্গ যা আমাদের বাংলা দেশের প্রতি ঘরে ঘরে আছে। তবে কি এতটা কষ্টের কোন সার্থকতা নেই? এতগুলো লোক অন্ধভাবে শুধু কি একটা আলেয়ার পিছনে ছুটে এসেছে? যদি প্রতি মন্দিরের কোন বৈশিষ্ট্য না থাকে —যদি এ সব শুধু লোকাচারই হয়, তবে কষ্ট সহ্য করবার এ বিপুল শক্তি মানুষ পেলো কোথা থেকে? দু'ধারে নিশ্চিত মৃত্যুর আহ্বানের ভিতর দিয়ে স্বার্থ-লোভী সংসারী মানুষ সকলের চেয়ে যে প্রিয় জীবন তাকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করে এত দূরে ছুটে আসে, সে কি পথের বৈচিত্রতার জন্য? তাই যদি হয়, তবে ক্ষীণ-দৃষ্টি, ভগ্নদেহ, স্থবির বৃদ্ধার দল এ বিপুল প্রাণশক্তি কোথা থেকে পায়?

এ রকম কত কি ভেবে চলেছি, এমন সময়ে রমেশ পিছন থেকে জানিয়ে দিল এখানকার সব বাড়ীই সমান। ঘরগুলো ছোট ছোট। উঠে দাঁড়ালে মাথায় কড়ি কাঠ এসে লাগে।

সামনের একটা বাড়ীর তিন তলায় একখানা ঘর ঠিক হ'ল। যতদিনই থাকি না কেন সব শুদ্ধ আমাদের তিনটাকা ভাড়া দিতে হবে। বিছানা করে সুশীলবাবু

শুয়ে পড়লেন, আর আমরা দু'জনে মন্দির দেখতে বেরিয়ে পড়লুম।

পশুপতিনাথের মন্দির :—

মন্দিরের সিং-দরজা দিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলুম। সামনেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মধ্যিখানে স্বর্ণের ছাউনীযুক্ত পশুপতিনাথের মন্দির। চূড়ায় তার স্বর্ণ-পতাকা ও ত্রিশূল। মন্দিরের সামনেই পশুপতিনাথের বাহন স্বর্ণমণ্ডিত দুটী বৃষ—একটী বড় এবং অপরটী ছোট। তার এক পাশে গরুড়-স্তম্ভ ও সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা গণেশজীর মূর্ত্তি। আশে পাশে আরো ছোট-খাট অনেক দেবমূর্ত্তি রয়েছে। সর্ব্ব-সিদ্ধি-দাতাকে প্রণাম করে আমরা পশুপতি-নাথের মন্দিরের দিকে চললুম।

শ্বেত-পাথরের মন্দিরের চারিধারে বড় বড় ঘরের ন্যায় বারান্দা। বারান্দার চার কোনে নানা কারুকার্য্যময় চারিটী রৌপ্য দ্বার। প্রত্যেক দরজা রেলিং দিয়ে ঘেরা। এই রেলিং এর সামনে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের দেবদর্শন করতে হয়। ভিতরে কালো মসৃণ পাথরের বেদীর উপর পঞ্চমুখী

শিবলিঙ্গ। মাথায় পাঁচটী স্বর্ণমুকুট—তার উপর পাঁচটী সুবর্ণের ছাতা। পত্র, পুষ্প ও মাল্যে মহাদেবের এখন রাজ-বেশ। মন্দিরের উর্দ্ধভাগ ছাউনীযুক্ত প্যাগোডার আকার বিশিষ্ট।

দেশ দেশান্তর হতে যাত্রীরা এসে এই কাঠের রেলিং ঘেরা অপ্রশস্ত দরজার সামনে ব্যাকুল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের প্রহরী তার ব্যাটুন্ দিয়ে দরজার সামনে থেকে ভিড় সরিয়ে সকলের দেখবার সুবিধা করে দিচ্ছে। প্রহরীর হাতে ব্যাটুন দেখে চমকে উঠ্লুম। চোখের সামনে ভেসে উঠলো আর একখানা মুখ—কিন্তু সে মুখ আর এ মুখে অনেক তফাৎ।

প্রাণভরে ভগবানকে দর্শন করা গেল। মনে মনে বল্লুম—'প্রভু, তুমি ত' পশুদের পতি। আমাদের পশুত্ব দূর করে মানুষ করে দাও।'

* * * * * *

মানুষের স্বাধীনতার ভিতর যখনই একটা গণ্ডী এসে পড়ে, মনে তখন জেগে উঠে একটা অতৃপ্তি। মন্দিরের রেলিংএর সামনে থেকে এত ভাল করে দেবদর্শন করেও

প্রাণে শান্তি এল না। মনে হতে লাগল, যদি আরও নিকটে যেতে পারতুম·········কিন্তু সে যে হবার নয়। চোখের সামনে ফুটে উঠল 'হরিজনদের' ব্যথা। অনেক দিন আমিও বন্ধুমহলে তর্ক করেছি যে, যদি বাহিরে থেকে দেবমূর্ত্তি দর্শন করা যায় তবে কি তাতে তৃপ্তি আসে না? কিন্তু আজ প্রথম অনুভব করলুম তাদের ব্যথার কি জ্বালা।

এখানকার লোকদের নিকট হতে শুনতে পেলুম নেপালের মহারাজাধিরাজ ও পশুপতিনাথের পুরোহিত ব্যতীত আর কেউ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না। ভক্তদের সামনে থেকে ভগবানকে সরিয়ে রাখবার কারণ নাকি দুটী।

এখন যেখানে মন্দির, সেখানে অনেক দিন থেকে একটী পরশ-পাথর ছিল। এর স্পর্শে এলে যে কোন জিনিষ সোনা হয়ে উঠত। অনেকে আবার এই পরশ-পাথরকে দেবতা বলে পূজা করতো। কোন এক অন্ধকার রাত্রে এক লোভী সাধু তার জুতার 'নালটী' পরশ-পাথরের মাথায় চাপিয়ে দেয়। নালটী সোনা হয়ে উঠবার

সঙ্গে সঙ্গে সাধু মারা গেল। ওদিকে নেপালের মহারাজা স্বপ্ন দেখলেন কে যেন তাঁকে এসে বলছেন— 'ওরে, আর যে পারি না। জুতা শুদ্ধ যে আমার মাথায় উঠল।' মহারাজা তখন এই মন্দির তৈয়ারী করে দিলেন। সেই থেকে সাধারণের প্রবেশ বন্ধ। এখানকার এই শিব লিঙ্গের তলায় সেই পরশ-পাথর আছে। সেইজন্য পশুপতিনাথের আর এক নাম পরেশনাথ।

আবার কেউ কেউ বলেন প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে মন্দিরের পুরোহিত দণ্ডীদের নিয়ে। তাঁরা মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ। দেশ থেকে আসবার সময়ে তাঁরা তাঁদের দেশের ছুংমার্গ এনেছেন। তার ফলে এই বাধার সৃষ্টি।

বাড়ী ফিরে দেখি অবস্থা শোচনীয়। নীচের এক তলায় গোটা দশেক উনুন জ্বলছে। কাঠের ধোঁয়ায় বাড়ী প্রায় অন্ধকার। সিঁড়ী দিয়ে অতিকষ্টে উপরে উঠে দেখি সুশীলবাবু দরজা জানলা ভেজিয়ে কম্বলমুড়ি দিয়ে বসে আছেন। তাঁকে জতুগৃহে ফেলে রেখে যাওয়াতে একেবারে চটে অস্থির। বন্ধু তাড়াতাড়ি চা করতে বসল দেখে প্রসন্ন হয়ে উঠলেন।

চা খাইয়ে বন্ধু হাতা-খুন্তি নিয়ে বসে গেল। আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে চিঠি লিখ্‌তে বসে পড়লুম। কাট্‌-মণ্ডু সহরে British legation; সেখানে গিয়ে চিঠি ফেলে আসতে হবে। নতুবা শীঘ্রই চিঠি পৌঁছবে বলে আশা হয় না। পথে সুশীলবাবুর বীরত্বের কথা জানিয়ে দ্বারভাঙ্গায় একটা পত্র লিখলুম।

রান্না প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তার সুগন্ধ আমাদের ক্ষিদেটাকে আরও বাড়িয়ে তুল্‌ছে। এমন সময়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমাদের ঘরের সামনে এসে বসে পড়লেন। তাঁর চুলগুলি সব সাদা—এমন কি ভুরুতেও পাক ধরেছে। তাঁকে দেখে আমাদের মুখুর্য্যে মশায়ের কথা মনে পড়ে গেল। আমরা ব্রাহ্মণ শুনে জোড় হস্তে প্রণাম করে জানিয়ে দিলেন তিনি আমাদের পাশের ঘরের বন্ধু। ঘরের ভিতরে এসে বসবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলুম। কিন্তু আমাদের 'সেবা' প্রস্তুত দেখে বাহিরেই বস্‌লেন।

নানা কথার পর খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন আমরা হেঁটে না ডাণ্ডিতে এসেছি। বন্ধু উত্তর দিল—'হেঁটে।'

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—আমিও মশাই ভাই। ঐ যে পাহাড়টা, চন্দ্রাগড়ী না কি যে নাম, সেখানে এসে, বুঝলেন, পাহাড়ের চেহারা দেখে আর হাঁটতে ভরসা পেলুম না। একেবারে একটা কুলির ঝোলাতে চেপে বসলুম।

ভদ্রলোকটীর নাম মাখনলাল। আমরা তাঁর সঙ্গে দাদা সম্পর্ক পাতিয়ে ফেল্লুম। তাঁর ভগ্নী ও স্ত্রীকে নিয়ে তিনি এখানে তীর্থ করতে এসেছেন।

বন্ধুটী আস্তে আস্তে বলে উঠল—কুলির ঝুড়িটা ভেঙ্গে পড়েনি ত'।

মাখনদা মুঁচকে হেসে বল্লেন—আরে সে কি ভাঙ্গবার ঝুড়িরে ভাই!

মাখনদা'র নিকট হতে খবর পাওয়া গেল, কোথায় কি দেখবার আছে। বাড়ীওয়ালার ছোট ছেলে রামেশ্বরজীকে নিয়ে তাঁরা এখানকার সমস্ত মন্দির দেখে এসেছেন। কালকে তিনি ও পাড়ার কয়েকজন মিলে লরী ঠিক করে 'নীলকণ্ঠ' দেখতে যাবেন; ইচ্ছা করলে আমরাও তাঁর সঙ্গে যেতে পারি। রমেশ জানিয়ে দিল, যে

কদিন আমরা এখানে আছি, তাঁকে আর ছাড়ছি না।

শুক্রবার—২১শে ফেব্রুয়ারী।

শাঁখ ও ঘণ্টার শব্দে ঘুমটা গেল ভেঙ্গে। মনে হল আবার বুঝি বাংলা দেশে ফিরে এসেছি। কানে এল মহাদেবের স্তব। মনে পড়ল শিবরাত্রির কথা। বন্ধুকে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে টেনে তুললুম। শীঘ্রই স্নান সেরে মন্দির দর্শন করে মাখনদা'র Regimentএ আবার যোগ দিতে হবে। সুশীলবাবু ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে জোর জোর পা ফেলে জানিয়ে দিচ্ছেন তাঁর পা all right।

ছোট্ট জানালা দিয়ে দূরের নীল আকাশের কোলে বরফ ঢাকা পাহাড় দেখা যাচ্ছে—ঠিক যেন কয়েকজন ঋষি ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন।

বন্ধুটীকে নিয়ে স্নানের জন্য বেরিয়ে পড়লুম। পশুপতিনাথে কল আছে, কিন্তু প্রতি বাড়ীতে নেই। রাস্তার মাঝে মাঝে এক একটা কল আছে। কাট্‌-মণ্ডু সহর থেকে এই জল আসে। আমাদের বাড়ীর দু'পাশে দু'টী কল।

একটা দেখলুম মেয়েরা দখল করে আছেন। অন্যটার কাছে গিয়ে দেখি তার অবস্থাও সেইরূপ। কন্‌কনে হাওয়া দেখে স্নান করতে ভরসা হ'ল না। অনেক কষ্টে একটু জল যোগাড় করে মাথাটা ধুয়ে ফেলা গেল।

বাড়ী এসে মাখনদা'র সঙ্গে দেখা। তিনি বল্লেন ঘণ্টাখানেক পরে তাঁরা নীলকণ্ঠে যাবেন। রামেশ্বরকে সঙ্গে করে নিকটের দুই একটা মন্দির দেখবার জন্য আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লুম।

গৌরী গঙ্গা :—

রামেশ্বরের সঙ্গে আমরা একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলুম। সিঁড়ী দিয়ে নীচে খানিকটা নেমে দেখি একটী পার্ব্বত্যনদী (বাঘমতীর অংশ) তর তর করে বয়ে চলেছে। বাঁধান ঘাটের উপর থেকে স্বচ্ছ জলের তলার বালি দেখা যাচ্ছে। দুই একটা পাথর জলের ভিতর থেকে মাথা উচু করে জানিয়ে দিচ্ছে তার উৎপত্তি স্থানের কথা। নদীর নাম গৌরী গঙ্গা। জল স্পর্শ করে আমরা মহাদেব দর্শন করলুম। সেখান থেকে সূর্য্যঘাট হয়ে গুহ্যেশ্বরীর মন্দিরে চল্লাম।

মঞ্জুশ্রী।

গুহ্যেশ্বরী মন্দির :—

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করলে, বিষ্ণুচক্রে তাহা একান্ন অংশে বিভিন্ন হয়। দেবীর জানুদ্বয় এখানে এসে পড়ে। তাই দেবী এখানে গুহ্যকালী। প্রশস্ত চত্বরের উপর ছোট মন্দির। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হয়। একটী বেদী সোনা দিয়ে মোড়া। সেই বেদীকে দেবীর মূর্ত্তি বলে পূজা করা হয়। মন্দিরের উপরটী সোনা দিয়ে মোড়া। চূড়ায় চারিটী সোনার ফলা ও তরবারি রয়েছে—তার পার্শ্বে একটী স্বর্ণ কলস। মন্দিরের চারিপাশে গণেশ-স্তম্ভ, গরুড়-স্তম্ভ ও ভৈরব স্তম্ভ প্রভৃতি রয়েছে। সেখান থেকে মঞ্জুশ্রীর মুর্ত্তি দর্শন করে পশুপতিনাথের মন্দিরের দিকে চল্লাম।

মঞ্জুশ্রী :—

নেপালের অসংখ্য দেব দেবীর মধ্যে মঞ্জুশ্রী খুবই জাগ্রত। রামেশ্বরজীর নিকট হতে এই সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প শুনা গেল। এখন যেখানে কাট্‌মণ্ডু সহর, পূর্ব্বে সেখানে একটা প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল। হ্রদের চারিপাশে বড় বড় পাহাড়। মঞ্জুশ্রী চীন দেশ থেকে নেপালে বাস করবার জন্য আসছিলেন। পশুপতিনাথের দিকে যাবার পথের

সামনে তাঁর এই কাট্-মণ্ডুর হ্রদ পড়ল। তিনি তাঁর অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি তরবারি দিয়ে পাহাড়ের এক স্থানে একটা গর্ত্ত করে ফেল্লেন। হ্রদের সমস্ত জল পাহাড়ের গর্ত্তের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বাঘমতী নদী হয়ে গেল। পরে সেই স্থানে একটা সহর গড়ে উঠে। সেই জন্য সকলে সহরকে কাট্-মণ্ডু বলে থাকে।

মঞ্জুশ্রীকে দর্শন করে আমরা পশুপতিনাথের মন্দিরে এলুম। প্রায় ঘণ্টাখানেক হয়ে এল দেখে রামেশ্বরকে পাঠালুম মাখনদা'কে খবর দিতে। বলে দিলুম আমরা মিনিট দশেকের ভিতর যাচ্ছি, তিনি যেন অনুগ্রহ করে আমাদের জন্য অপেক্ষা করেন।

আজ শিবরাত্রির বিশেষ উৎসব। সাধু, সন্ন্যাসী ও যাত্রীর কোলাহলে মন্দির মুখরিত। চারিটী দ্বার খোলা। কিন্তু লোকের ভিড়ের জন্য রেলিং অবধি যাবার উপায় নেই। যাত্রীরা যদিও কোন রকমে কাঠের গণ্ডীর সামনে পৌঁছয়, কিন্তু হাতের ফুল দেবতার পায়ে পৌঁছল কি না দেখবার আগেই তাদের অনেক দূরে সরে যেতে হচ্ছে। হিন্দুস্থানি ভায়াদের লোটার জলে জামা ভিজে উঠল।

রমেশের বীরত্বে আমাদের একবার ক্ষণিকের জন্য দেবদর্শন হ'ল।

রামেশ্বর এসে খবর দিল মাখনদা' বা তাঁর দলের কাহারও সঙ্গে তার দেখা হয় নি। বাড়ী এসে দেখি মাখনদা'র ঘর তালা বন্ধ। একটু বিশ্রাম করে আবার বেরিয়ে পড়লুম যদি আর কোন দলের সঙ্গে ভিড়তে পারি। লরীর আড্ডায় এসে দেখি এক দল চলেছে। তাঁদের সঙ্গে যাত্রা করা গেল। ঠিক হ'ল আমরা ভাটগাঁও, নীলকণ্ঠ হয়ে বাইশ ধারায় যাবো। তারপর কাট্‌-মণ্ডু হয়ে পশুপতিনাথ। ভাড়া আমাদের প্রত্যেককে একটাকা তিন আনা দিতে হবে।

সামনেই তুষার আবৃত পাহাড়। কোন কোন পাহাড়ের উপর সূর্য্যের আলো পড়াতে বরফ গলে সেখানে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়েছে, আবার কোথাও বরফ গলতে থাকায় সেখানে পাহাড়ের স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে। মর্ত্তের লোককে যেন পাহাড় জানিয়ে দিচ্ছে যে গিল্‌টি-করা জিনিষ বেশীদিন থাকে না—একদিন না একদিন তার স্বরূপ বেরিয়ে পড়বেই। বাঘমতী নদী পার হয়ে উচু নীচু সরু পথ দিয়ে

আমরা এই বরফ ঢাকা পাহাড় ধরবার জন্য ছুটেছি। কিন্তু যত এগিয়ে চলি, পাহাড় যেন তত পেছিয়ে যায়। এইরকম লুকোচুরির ভিতর দিয়ে মাইল আষ্টেক যাবার পর ভাটগাও সহরে এসে পড়লুম।

ভাটগাঁও :—

১৭০০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ভূপতীন্দ্র মল্ল ছিলেন নেপালের রাজা। তাঁর রাজধানী ছিল এই ভাটগাঁয়ে।

বিখ্যাত দরবার কক্ষ তাঁরই সময়ে নির্ম্মিত হয়। এই কক্ষের দ্বারগুলি স্বর্ণময়। সামনেই মহারাজার ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি। একপাশে একটা পিতলের ঘণ্টা। এই ঘণ্টা বাজালে প্রজারা রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে মহারাজার কাছে তাদের অভিযোগ জানাত।

পঞ্চস্তর মন্দির :—

রাজ-প্রাসাদের নিকটে পঞ্চস্তর মন্দির। পথ-প্রদর্শক জানিয়ে দিলে এই মন্দিরের এক একখানি ইট মহারাজ ভূপতীন্দ্র মল্লের হাতের গাথা। যদিও তিনি এদিকে খুব সৌখিন ছিলেন কিন্তু শিল্পের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ

নেপালের পথে

পঞ্চস্তর মন্দির (ভাটগাঁও)

ছিল। এই মন্দিরটী দেখলে তাঁর শিল্প-প্রীতির কথা মনে পড়ে।

পাঁচটী ধাপ দিয়ে মন্দিরে উঠতে হয়। প্রথম ধাপে রাজপুত বীরের প্রতিমূর্ত্তি; দ্বিতীয় ধাপে দুইটী প্রস্তরের হস্তী, তৃতীয় ধাপে সিংহ; চতুর্থ ধাপে শেন-সিংহ এবং পঞ্চম ধাপে সিংহ ও বাঘিনীর মূর্ত্তি। তান্ত্রিক দেবতাকে এখানে প্রতিষ্ঠা করে পূজো করবার কথা ছিল, কিন্তু কি জানি কোন কারণবশতঃ এখানে আর দেবতার প্রতিষ্ঠা হয় নি। নেপালীদের ধারণা এখানে ভৈরব বাস করেন। পাঁচধাপ মন্দিরের উপর পাঁচতলা প্যাগোডাকৃতি চূড়াটী এই মন্দিরের সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

দত্তাত্রের মন্দির :—

এক সময়ে সূক্ষ্ম কারু-শিল্পে নেপাল যে কত উন্নত ছিল, তা এই মন্দিরটী দেখলে বেশ বুঝতে পারা যায়। মন্দিরের ভিতর দত্তাত্রেয় ঋষি এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্ত্তি। দত্তাত্রে মন্দিরের সামনে একটী ছোট মন্দির আছে, সেখানে ভীম ও দ্রৌপদীর মূর্ত্তি।

এখানকার পথগুলি খুব সরু সরু। তার দুধারে সাত

আট তলা বাড়ী। প্রত্যেক বাড়ীর জানালা, দরজার উপর নক্সা কাটা। কোথাও আবার সূক্ষ্ম জালতি দিয়ে জানালা তৈয়ারী হয়েছে। কিন্তু গত ভূমিকম্পে অনেক বাড়ী ও মন্দির একেবারে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে।

নীলকণ্ঠ :

ভাটগাঁও থেকে ফিরে আবার পশুপতিনাথের রাস্তায় এসে পড়লুম। সেখান থেকে কাট্‌-মণ্ডুর উপর দিয়ে আমরা নীলকণ্ঠে পৌঁছুলুম। পশুপতিনাথের মন্দির থেকে নীলকণ্ঠ প্রায় মাইল দশেক। একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের (খুব সম্ভব চন্দ্রাগড়ীর অংশ) তলাতে নীলকণ্ঠের মন্দির। দেবতার নাম শুনে ভেবেছিলুম মহাদেবের মন্দির, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করে দেখি বিষ্ণুর অনন্ত-শয্যা।

পাথরদিয়ে একটা চৌবাচ্চার মত করা হয়েছে। ঝরণার জল এসে সেই চৌবাচ্চায় জমা হচ্ছে। সেই জলের ভিতর বিরাট পুরুষ, চতুর্ভুজ নীলকণ্ঠের অনন্তশয্যা। হস্তে গদা, পদ্ম, শঙ্খ ও চক্র। মাথা এবং হাতের উপর সাপ কুণ্ডলি পাকিয়ে আছে।

মন্দিরের চারিদিকের দৃশ্য বড় মনোরম। একদিকে

দত্তাত্রে (ভাটগাঁও)

পাহাড় আর অপর দিকে অনন্ত প্রসারিত মাঠ। মাঠের উপর একটী ছোট বাড়ী। বাড়ীটী শুনলুম থাইসিস-ওয়ার্ড।

বাইশধারা—

নীলকণ্ঠ থেকে আমরা বাইশ-ধারাতে চল্লাম: বাইশধারা কাট্-মণ্ডু সহরের খুব নিকটে। এখানে একটী ছোট চৌবাচ্চার জলের ভিতর বিষ্ণুর অনন্ত-শয্যা। কেহ কেহ বলেন নীলকণ্ঠে বিষ্ণুর মূর্ত্তি আপনা হতে হয়েছে, আর এখানকার মূর্ত্তি কোন একজন মহারাজার তৈয়ারী।

চারিদিকে সুন্দর প্রশস্ত বাগান। বাগানের ভিতর একটি বড় চৌবাচ্চায় নানা রঙ্গের মাছ রয়েছে। হরিদ্বারের মত বড় শোল, লাল ও নীল মাছ এইজলে খেলা করে বেড়াচ্ছে। অনেকে এই মাছের জন্য মুড়ি ও ছোলা ভাজা জলে ফেলে দিচ্ছে।

এই চৌবাচ্চার বাঁধান পাড়ের উপর বাইশটা নল দেওয়া আছে। সেখান দিয়ে ঝরণার জল বাইশ ধারাতে এসে বাহিরে পড়ছে। সেইজন্যে এই জায়গার নাম হয়েছে বাইশ-ধারা।

বাইশধারা থেকে আমরা কাট্-মুণ্ডু সহরে এসে পড়লুম। সৈনিকদের কুচকাওয়াজ হবে বলে Parade groundএ অনেক লোক সমবেত হয়েছে। আমরাও লরী থেকে নেমে পড়লাম।

সেনাদের কুচ-কাওয়াজ :—

নেপালের মহারাজা থেকে সামান্য নেপালী কুলিও পশুপতিনাথকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে থাকেন। নেপাল-বাসীদের বিশ্বাস যে স্বয়ং ভগবান পশুপতিনাথের দয়ায় তারা আজ বিশ্ব-দরবারে স্বাধীন বলে সম্মান পেয়ে আসছে। শিব-রাত্রির দিন পশুপতিনাথের বিশেষ উৎসব। এই পবিত্র দিনটা তারা নানা সামরিক কুচকাওয়াজের ভিতর দিয়ে কাটিয়ে দেয়। বেলা তিনটের সময় মুহুর্মুহুঃ কামানের গর্জ্জনের সঙ্গে mock fight আরম্ভ হ'ল। কামানের গর্জ্জন পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে নেপালের বীরত্বের কথা জগতবাসীকে জানিয়ে দিল। ঘণ্টাখানেক পরে নকল যুদ্ধ শেষ হ'ল।

*　　*　　*　　*

কাট্-মুণ্ডু সহরের ভিতরে আমাদের চাঁদনি-চকের মত

প্রকাণ্ড বাজার—নাম ইন্দ্রচক্। কাল এখানে এসে ভাল করে দেখা যাবে বলে তাড়াতাড়ি একবার বাজারটা ঘুরে পশুপতিনাথের দিকে রওনা হওয়া গেল।

কাট্‌মণ্ডু সহর থেকে পশুপতিনাথের মন্দির প্রায় মাইল চারেক। লরী পাওয়া গেল না বলে হেঁটেই চল্লুম। সুশীলবাবুর খুব কষ্ট হতে লাগল—কিন্তু কোন উপায় নেই। পথে এক নেপালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি কলিকাতায় অনেক দিন ছিলেন। তাঁর নিকট হতে নেপাল সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া গেল।

নেপালের মহারাজাধিরাজ হচ্ছেন প্রকৃত রাজা। তিনি হচ্ছেন পাঁচ-সরকার। প্রধান মন্ত্রীকে কেউ কেউ মহারাজা বলেন। তিনি হচ্ছেন—তিন সরকার। সমস্ত রাজ্যশাসনের ভার এই প্রধান মন্ত্রীর উপর। প্রধানের পরে একজন Viceroy আছেন। প্রধান মন্ত্রীর অনুপস্থিতে তিনি রাজ্য শাসন করে থাকেন। মহারাজাধিরাজ ও প্রধান মন্ত্রী এখন শিকারের জন্য ভীমফেরীর জঙ্গলে আছেন। কাট্‌-মণ্ডু সহরের ভিতর 'British legation'। এখানে বৃটিশ-রাজদূত বাস করেন। তাঁদের আলাদা

টেলিগ্রাফ লাইন ও চিঠি পত্র পাঠাবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। সেখানে চিঠি ফেল্লে বা তার করলে তবে তাড়াতাড়ি কলিকাতায় পৌঁছবে। নেপালের নিজেদের mint (টাকশাল) আছে। সেখানে টাকা. পয়সা, পাই-পয়সা, এমন কি মোহর পর্য্যন্ত তৈয়ারী হয়।

নেপালী পুরুষ ও মহিলারা নানা বেশভূষা করে পশুপতিনাথ দর্শনে চলেছেন। একটা সোজা পথ ধরে আমরাও যাচ্ছি ; তবুও যেন পথ কমে না ! পাশে একটা বড় পুকুর দেখা গেল, কিন্তু জল খুব কম। আমাদের নেপালী বন্ধু বল্লেন যে, যখন হর-ধনু ভঙ্গ হয় তখন সেই ধনুকের খানিকটা অংশ সীতামারীতে (জনকপুর) এবং খানিকটা নেপালের এই পুকুরে এসে পড়ে। সেইজন্য এই পুকুরটী একটী বড় তীর্থ-স্থান। তখনও ভাবতে পারিনি যে এই তীর্থস্থান নিয়ে রমেশ পরে একটা ফ্যাসাদ করে বসবে।

* * * *

সন্ধ্যার একটুপরে আমরা বাড়ী ফিরে এলুম। এতটা

হাঁটাতে সুশীলবাবুর পাটা বেশ টন্ টন্ করছে; তবুও সন্ধ্যা-আরতি দেখতে আমাদের সঙ্গে চল্লেন।

আরতির দৃশ্য বড় চমৎকার। চারিদিকে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলছে। অনেক সাধু সন্ন্যাসী প্রাঙ্গণে বসে জপ ও পূজা করছেন। কেউ কেউ খালি গায়ে ছাই মেখে ভজন গাহিছেন। একটু এগিয়ে দেখি নেপালের Viceroy, তাঁহার স্ত্রী, পুত্রবধূ প্রভৃতি মন্দির প্রদক্ষিণ করছেন। মনে পড়ল আমাদের দেশের কথা। যদি কোন বড়লোক যান মন্দিরে পূজাদিতে, গরীবদের প্রায় এক ক্রোশ দূর সরে যেতে হয়! কিন্তু স্বাধীন দেশে সবাই স্বাধীন। রাজ-পরিবারের পাশ দিয়ে কত লোক চলেছে, কিন্তু কারো কোন আপত্তি নেই। দেবতার চোখে সব ভক্তই সমান তাঁর কাছে কোন ভেদাভেদ থাকতে পারে না।

সকালের চেয়ে ভিড়টা এখন অনেক কম। সমস্ত দিন ধরে ভগবানকে দেখবার জন্ত মারামারি করে যাত্রীরা এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাত্রে মন্দির খোলা থাকবে

শুনে সকলেরই আশা হয়েছে, অদৃষ্টে তাদের আজ দেব-দর্শন নিশ্চয়ই ঘটবে।

মন্দিরের রেলিং এর সামনে দাঁড়িয়ে নিবিষ্টমনে আরতি দেখছি। চোখে পড়ল রাজ-পরিবারের লোকেরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাঁদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা পশু-পতিনাথকে নিবেদন করছেন। আরতি শেষ হয়ে গেল; পূজারী এসে আশীর্ব্বাদী ফুল আমাদের দিয়ে গেলেন।

বাড়ী ফিরে দেখি মাখনদা' তাঁর ঘরে বসে আছেন। আমরা ফিরেছি জানাবার জন্যে বন্ধুটী বেশ শব্দকরে দরজা খুলে ফেল্লে। কিন্তু মাখনদা' আমাদের চেনেন বলে মনে হ'ল না। তারপর অনেক বার আমাদের ঘরের সামনে দিয়ে তাঁকে যেতে আসতে দেখা গেল কিন্তু আমাদের সঙ্গে একটী কথাও তিনি বল্লেন না।

অনেক যাত্রীরা চল্লেন মন্দিরে রাতটা কাটাতে। বামেশ্বর একটা মশাল নিয়ে উপস্থিত। মশালটা সে সমস্ত রাত মন্দিরে জ্বালাবে। বন্ধু তাকে খুব ভোরে এসে আমাদের আর যা কিছু দেখবার আছে, সেখানে নিয়ে যাবার জন্য বলে দিল।

রাত অনেক হয়েছে দেখে শুয়ে পড়া গেল। মাঝে মাঝে ভাঙ্গাদেওয়ালের ভিতর দিয়ে মাখনদা'র আয় ব্যয়ের হিসাব কানে আসতে লাগল।

শনিবার ২২শে ফেব্রুয়ারী:—

ক্ষুদ্র জানালাটীতে ভোরের আলো ফুটে উঠল। কিন্তু শীতের জন্য কম্বল ছাড়তে ইচ্ছা করছে না। মাখনদা'র ঘর থেকে শব্দ ভেসে এল—'এ রামেশ্বরজি! হাম্ যদি মিঠাই পুরী তোম্ লোক্‌কে কিনে দেগা, তোম্ কি সেবা নেহি করে গা?' বন্ধুটী যে এতক্ষণ জেগেছিল, তা বুঝতে পারিনি। আহারের নিমন্ত্রণ হচ্ছে শুনে একেবারে লাফিয়ে উঠল। আমাদের সকলকে কম্বলের ভিতর থেকে টেনে তুলে জানিয়ে দিল যে আমাদের মত সৎ ব্রাহ্মণ থাকতে মাখনদা' একা রামেশ্বরজীকে খাওয়াতে পারবেন না।

মাখনদা'কে গম্ভীরভাবে বসে থাকতে দেখে, বন্ধুর আর সাহস হল না তাঁকে কিছু বলতে। কালকে অনেকটা হাঁটার জন্যে সুশীলবাবুর পা টা বেশ টাটিয়ে উঠেছে তাঁকে বাড়ীতে রেখে আমরা দু'জনে একটু ঘুরতে বেরিয়ে পড়লুম।

খাবারের দোকানের সামনে বেজায় ভিড়। কালকের

শিব-রাত্রির উপবাসের পর গরীবদের মিঠাই পুরী খাইয়ে বাঙ্গালী মহিলারা পুণ্য সঞ্চয় করছেন। আমাদের কয়েক-জন এসে ধরলে, তাদের মিঠাই খাইয়ে পুণ্য সঞ্চয় করবার জন্য। কিন্তু আমাদের হাব-ভাব দেখে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

মন্দিরের মধ্যে অনেকে পুজো দিতে চলেছেন। পূজারীর হাতে ভক্তরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নৈবেদ্য তুলে দিচ্ছেন। তিনি দেবতার পায়ে তা স্পর্শ করিয়ে তাদের ফিরত দিচ্ছেন। অনেক তীর্থক্ষেত্রে পাণ্ডাদের জুলুম দেখেছি। ষোল আনার পুজোর কমে মুক্তি মিলবে না; তার উপর আরো ষোল আনা পাণ্ডা ঠাকুরের প্রণামী—তীর্থক্ষেত্রে হাট বাজারের মত যেন মুক্তি বিক্রয় হচ্ছে। কিন্তু এখানে ভক্তরা যে যা পারে তাই ভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছে। আর পূজারী ঠাকুর সর্ব্বদাই প্রফুল্লভাবে যাত্রীদের নৈবেদ্য ভগবানের কাছে উৎসর্গ করে দিচ্ছেন।

ফিরবার পথে দ্বারভাঙ্গার চিত্তবাবু ও তাঁর মার সঙ্গে দেখা। সুশীলবাবুর শরীর অসুস্থ শুনে তিনি চল্লেন আমাদের সঙ্গে সুশীলবাবুকে দেখতে।

বাড়ী ফিরে দেখি মাখনদা'র ঘরে রামেশ্বরজীর ভোজন-পর্ব্বটা খুব সমারোহে চলেছে। মাখনদা' গলায় কাপড় দিয়ে করজোড়ে বসে আছেন—ভগ্নী ও স্ত্রী জামাই আদরে রামেশ্বরজীর সেবা করিয়ে চলেছেন। রামেশ্বরকে নিয়ে এখন আমাদের অনেক জায়গায় যেতে হবে। অতএব তাড়াতাড়ি ভোজনটা সেরে নেবার জন্য বন্ধু হুকুম দিয়ে বসল। চিত্তবাবুকে সুশীলবাবুর কাছে রেখে রামেশ্বরের সঙ্গে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

বোধনাথের স্তূপ :—

গুহ্যদেবীর মন্দিরের সামনের ছোট পুলের উপর দিয়ে বাঘমতী নদী পার হয়ে খোলামাঠের উপর পড়া গেল। একটু এগিয়েই প্রকাণ্ড একটা গম্বুজ সামনে দেখতে পেলুম। এইটী হচ্ছে বোধনাথের স্তূপ। রামেশ্বরের নিকট শুনা গেল, এক রাজা তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য স্তূপটী নির্ম্মাণ করে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি স্থাপন করেন। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেই সামনে বুদ্ধদেবের মন্দির। শুনা গেল যে মন্দিরের ভিতর একটা প্রদীপ প্রায় একশ বছর ধরে জ্বলে আসছে। বুদ্ধ মূর্ত্তি ব্যতীত আরো দুই একটা মূর্ত্তি মন্দিরে

আছে। এক সময়ে মন্দিরের পাশে অনেক জল জমা ছিল। এই গম্বুজ দিয়ে সেই জলকে আটকে রাখা হয়েছে। কয়েক বৎসর অন্তর এই গম্বুজের ভিতর থেকে জল বার করে দেওয়া হয়। সেই পবিত্র জল পান করবার জন্য তিব্বত থেকে লোক এ পর্য্যন্ত আসে। মন্দিরের উপরের সিঁড়ি দিয়ে গম্বুজের উপর উঠলুম। দূরে কাট্-মণ্ডু ও পশুপতিনাথের সহরটী ছবির মত দেখা যেতে লাগল। গম্বুজের উপরটা সোনা দিয়ে মোড়া ও মাথায় একটি সোনার টোপর বসান।

মন্দিরটী তিব্বতীদের একটী পবিত্র তীর্থস্থান। প্রাচীরের গায়ে অসংখ্য তাঁবার কৌট টানান আছে। এই কৌটর মধ্যে বৌদ্ধ জগতের অনেক ধর্ম্মলিপি আছে। তিব্বতীরা মন্দির পরিক্রম করতে করতে এই কৌটগুলি ঘুরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে—যার নাম করে এই কৌট ঘুরিয়ে দেওয়া হয় তার নাকি সমস্ত পাপটা খণ্ডন হয়ে যায়।

সেখান থেকে বৌদ্ধতীর্থ স্বয়ম্ভুনাথ হয়ে বাঘমতীর তীরে ফেরা গেল।

বাঘমতী নদীর তীরে এলে কাশীর কথা মনে পড়ে যায়।

কাশীতে যেমন গঙ্গার ধারটী বাঁধান এবং স্নানের জন্য অসংখ্য ঘাট রয়েছে এখানেও ঠিক সেই রকম। ওপারে সাধুদের কুটীর দেখা যাচ্ছে, তার পাশে ধর্ম্মশালা ও পশুপতিনাথের মন্দির। আমাদের নিকট গঙ্গা যেরকম পবিত্র নেপালীদের কাছে বাঘমতীর জলও সেইরূপ পবিত্র। কেউ কেউ এই জল-ধারাকে গঙ্গা বলে। বাঘমতীর জলে পশুপতিনাথের পূজা হয়ে থাকে। নদীর তীরের উপর বড় বড় চাতাল—সেখানে শব দাহ হয়। নদীর মোহনার দিকে রাজা এবং রাজ-পরিবারের স্নানের জন্য ঘাট রয়েছে।

পশুপতিনাথের বাজার :—

পশুপতিনাথের মন্দির আর একবার দর্শন করে বাজারে আসা গেল। মন্দিরের পাশে খাবারের দোকান; দোকানটী বেশ পরিষ্কার। পুরী, জিলাপী, সন্দেশ, নানারকমের মিষ্টি ও তরকারী পাওয়া যায়। কাঁচা কমলালেবুর খোসা দিয়ে এরা একটা চাটনি করে; খেতে বড় উপাদেয়। বন্ধুর Boilerএর কয়লার জন্য এখান হতে কিছু খাবার কেনা হল। খাবারের দোকানের পাশে সারি সারি চাল,

ডাল ও নানা তরি-তরকারীর দোকান। দোকানে খুব ভাল সরু চাল পাওয়া যায়। প্রতি সের চার আনা। চাল ও তরিতরকারী কিনে বাড়ী এসে দেখি সুশীলবাবু ষ্টোভ জ্বেলে রান্না আরম্ভ করে দিয়েছেন।

আজকে সকালের দিকটা বেশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু এখন রোদ উঠতে ঠাণ্ডা কমে গিয়ে একটু একটু গরম বোধ হচ্ছে। দুজনে বাঘমতীতে স্নান করতে যাব বলে সবে তেল মাখতে বসেছি, এমন সময়ে মাখনদা' এসে উপস্থিত।

একটা প্রাতঃপ্রণাম জানিয়ে মাখনদা' কালকের ঘটনার জন্য দুঃখ করতে লাগলেন। বল্লেন—আমরা মটর ঠিক করে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি, কিন্তু চার-তলার জেঠাইমা বড় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁকে এত করে বল্লুম যে ছেলে দুটী আমাকে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে বিশেষ করে অনুরোধ করেছে, কিন্তু রোদে সকলের কষ্ট হবে বলে জেঠাইমা মটর ছাড়তে বল্লেন।

বন্ধুটী তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—আপনাদের সঙ্গে আমাদের না যাওয়াতে একরকম ভালই হয়েছে। আমরা আপনাদের চেয়ে অনেক বেশী জায়গা দেখে এসেছি।

তারপর আরম্ভ হল, আমরা কোন কোন জায়গায় গিয়েছিলুম তার লিষ্ট। উপরের জেঠাইমা তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। হর-ধনু ভঙ্গের পুকুরের কথা শুনে তিনি রমেশকে ধরে বসলেন তাঁকে একবার সেখানে নিয়ে যেতেই হবে। রমেশ যত বলে সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা সেখানে গিয়েছিলুম, এখন আমাদের পথ চিনে সেখানে যাওয়া অসম্ভব, তবুও তিনি ছাড়েন না। অবশেষে রামেশ্বরের ভাই বীরভদ্রকে জেঠাইমার হরধনু ভঙ্গের পুকুর দেখানর ভার দিয়ে আমরা স্নান করতে বেরিয়ে পড়লুম।

তিন দিন পরে আজ স্নান করে শরীরটা বেশ স্নিগ্ধ হল। তার উপর আহারটা হ'ল বেশ গুরুতর। সামনেই দেখি জেঠাইমা তাঁর ছোট দলটী নিয়ে মাখনদার জন্য বসে আছেন। মাখনদাকে জলদি করতে বলে জেঠাইমার সঙ্গে গল্প করতে বসলুম। শুনলুম জেঠাইমা তাঁর পাড়ার দুটী মেয়ের সঙ্গে এখানে এসেছেন—সঙ্গে কোন পুরুষ অভিভাবক নেই।

জিজ্ঞাসা করলুম—এইযে আপনি এতদূরে একা এলেন ছেলেরা তাতে আপত্তি করল না?

তিনি বল্লেন—ছ-বছর আগে যখন বদ্রিনারায়ণে যাই, ছেলেরা তখন মহা হৈ চৈ করে উঠল ; কিছুতেই আমাকে একা যেতে দেবে না। অনেক কষ্টে তাদের রাজী করে বদ্রিনারায়ণে গেলুম। ছেলেরা ভেবেছিল, মাকে আর ফিরতে হবে না। কিন্তু যখন জ্যান্ত জ্যান্ত ফিরে এলুম ছেলেরা একেবারে অবাক। তারপর পুরী, দ্বারকায় গিয়েছি, ছেলেরা আর কোন আপত্তি করেনি। সঙ্গের এই মেয়েদুটীকে বদ্রিনারায়ণ আমায় মিলিয়ে দেন—একটী আমায় মা বলে, আর অপরটীর আমি জেঠাইমা। আমার ভবঘুরে জীবনে এরাই আমার সাথী, ... পশুপতিনাথের নাম নিয়ে যখন বেরিয়ে পড়েছি, তখন কোন মুস্কিলে পড়তে হবে না—এ বিশ্বাস যদি না থাকে, তাহলে এখানে আসাই বৃথা!

জেঠাইমা অনেকদিন তিনকুড়ী পার হয়েছেন। কিন্তু এই বয়সে আরও দুইটী মেয়ের ভার নিয়ে এই অজানা দেশে তীর্থ করতে আসতে দেখে বিস্মিত হলুম। মাখনদা এসে জানিয়ে দিলেন তিনি প্রস্তুত। আমরা কাট্‌-মণ্ডুতে বেড়াতে যাচ্ছি শুনে তিনি তাঁর দল নিয়ে আমাদের সঙ্গে

চল্লেন—ঠিক হল ফিরবার পথে তাঁরা হর-ধনুর পুকুর দেখে বাড়ী আসবেন। কাট্-মণ্ডু সহরে পৌঁছে মাখনদা গেলেন 'British-legation' দেখতে আর আমরা চল্লুম সহরের দিকে।

বৃটিশ লীগেশান ঃ—

সে আজ অনেকদিনের বিস্মৃত কাহিনী। তিব্বত থেকে একদল মঙ্গোলীয় জাতি হিমালয় পার হয়ে এসে নেপালে প্রথম বসবাস আরম্ভ করে। এদের নাম ছিল নেওয়ার। ধর্ম্মে তারা বৌদ্ধ। রাজ্য বিস্তারের দিকে মন না দিয়ে তারা তাদের সমস্ত শক্তিটা রাজ্য গঠনেরদিকে নিয়োজিত করল। পাহাড় হয়ে উঠল উর্ব্বর, রাজ্যে এল সুখ শান্তি। চারিদিকে ললিতকলার বিকাশ সাধনের একটা সাড়া পড়ে গেল। তার ফলে নানা কারুকার্য্যময় প্যাগোডার আকার-বিশিষ্ট গগনস্পর্শী মন্দির ও প্রাসাদ নির্ম্মিত হল। মন্দিরে অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি স্থাপিত হয়ে মহা ধুমধামে পূজা চলতে থাকল। শুনা যায় এই সময়ে পশুপতিনাথের মন্দির নির্ম্মিত হয়। সেইজন্য আমরা আজও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব মন্দিরের উপর দেখতে পাই।

তারপর এল আর এক যুগ। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমানের হাত থেকে ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষার আশায় একদল রাজপুত চিতোর ত্যাগ করে পশ্চিম নেপালে এসে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে। ক্রমে ক্রমে এই বৈদেশিক রাজপুত ও নেপালের অন্যান্য জাতির সমবায়ে গুর্খা নামে একটা বীরজাতির অভ্যুদয় হয়। কিছুদিনেব ভিতর আশে পাশে অনেক স্থান জয় করে গুর্খারা তাদের বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগল। অবশেষে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে গুর্খারা সমস্ত নেপাল জয় করে ফেল্লে। ক্রমে ক্রমে তাদের রাজ্য পূর্ব্বদিকে ভুটান ও পশ্চিমে শতদ্রু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হল।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে নেপালের সীমানা নিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর সঙ্গে প্রথম বিরোধ উপস্থিত হয়। লর্ড হেষ্টিংস (Earl of Moira) নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। পৃথিবীর মানচিত্র থেকে এই স্বাধীন রাজ্যটাকে মুছে ফেলবার জন্যে চারদিক থেকে তাকে আক্রমণ করা হল। কিন্তু তাদের গরিলা যুদ্ধের সামনে ইংরেজ পরাজিত হতে লাগল। প্রধান সেনাপতি জিলেস্পি এই যুদ্ধে মারা গেলেন। চারিদিকে একটা হতাশার ভাব ফুটে উঠল।

এমন সময়ে খবর এল সেনাপতি অক্টরলোনি মেলন যুদ্ধে গুর্খা সেনাপতি অমর সিংকে পরাজিত করেছেন। সিগৌলীতে তখন ইংরাজদের সঙ্গে একটা সাময়িক সন্ধি হল।

নেপাল-দরবার কিন্তু সে সন্ধি মানতে রাজী হলেন না। আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল। সেনাপতি অক্টরলোনি তাঁর সৈন্য নিয়ে কাট্‌-মণ্ডু জয় করতে চল্লেন। অনেক যুদ্ধের পর নেপাল গবর্ণমেণ্ট 'সিগৌলীর' সন্ধি-পত্র গ্রহন করলেন। গাড়ওয়াল, কুমায়ুন ও সিকিম প্রদেশ ইংরাজরা পেলেন। একজন করে বৃটিশ রাজদূত নেপালের রাজ-ধানী কাট্‌-মণ্ডুতে থাকবেন বলে ঠিক হল। এই রাজ-দূতের জন্য কাট্‌-মণ্ডুর বুকে সুদৃশ্য British legation তৈয়ারী হয়ে উঠেছে।

* * * * *

নেপালের উত্তরে তুষার ধবল হিমালয় ও তিব্বত ; দক্ষিণে বিহার, যুক্ত প্রদেশের উত্তর অঞ্চল ও নেপাল-তরায়ের প্রসিদ্ধ জঙ্গল ; পূর্ব্বে সিকিম ও দার্জ্জিলিং ; পশ্চিমে নৈনিতাল ও আলমোড়া। লম্বায় পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৪৫০ মাইল ও চওড়ায় উত্তর-দক্ষিণে ১৫৫ মাইল। মোট পরিমাণ ৫৪০০০ বর্গ

মাইল। রাজ্যের লোক সংখ্যা ৫৬ লক্ষ। গুরুং ও মগার সম্প্রদায় থেকে প্রধাণতঃ সেনাদল গঠিত হয়। নেপালের স্থায়ী সৈন্য প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

চিরশুভ্র তুষারাচ্ছাদিত পাহাড়ের কোলে ছোট্ট উপত্যকা। তার চারিদিকে চারটী সহর—ভাটগাঁও, পশু-পতিনাথ, কাট্‌-মণ্ডু ও পাটান। নেওয়ারদের সময়ে ভাটগাঁও, পাটান ও কাট-মণ্ডুতে তিনজন স্বাধীন রাজা ছিলেন। গুর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণ সকলকে পরাজিত করে কাট্‌-মণ্ডু সহরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন।

কাট্‌-মণ্ডু সহর :—

কাট্‌-মণ্ডু বা কাট্‌-মটু সহরটী একেবারে বাংলাদেশের মত সমতল—কোথাও তার উচু নীচু নেই। বাহিরে থেকে দেখলে মনে হয় না যে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর এই সহর। সামনেই কুচ-কাওয়াজের বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠের পশ্চিমে রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরাদি সহ পুরাতন সহর।

১৯৩৪ সালের প্রবল ভূমিকম্পে পুরাতন সহরটীর সমস্ত
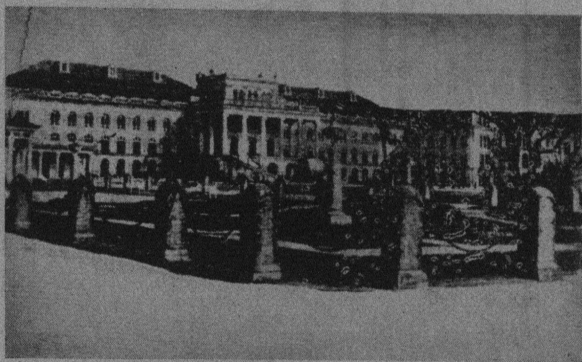
রাজ-প্রাসাদ (কাট্‌-মণ্ডু)

শ্রী নষ্ট হয়ে গিয়াছে। নানা কারুকার্য্যময় মন্দির ও অত্যুচ্চ স্তম্ভ সমূহ ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। এই ধ্বংসাবশেষের একদিকে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রাজাদের সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ এবং তারই নিকটে কুলদেবতা 'তালেজুর' মন্দির। এখানকার রাজপথ গুলি সংকীর্ণ এবং পথের দুপাশে অভ্র-ভেদী অট্টালিকা। প্রত্যেক অট্টালিকা প্যাগোডার আদর্শে নির্ম্মিত। দরজা ও জানালাগুলি ভাটগাওর মত নানা কারু-কার্য্য খচিত ও জালতি বিশিষ্ট। এখানে একটী বিশাল দরবার কক্ষ আছে—নাম তার হনুমান-দোখা।

ময়দানের অপরদিকে নূতন সহর। রাস্তাগুলি প্রশস্ত। বাড়ীগুলি য়ুরোপীয় ধরণের। এখানে কোন প্যাগোডা বা মন্দির নেই। আছে কেবল সেনাবারিক, বিদ্যালয়, কলেজ, হাঁসপাতাল, রাজ-প্রাসাদ ও বড় বড় রাজ পুরুষদের বাড়ী। গত মহাযুদ্ধে যে সমস্ত নেপালী-সৈন্য সুদূর য়ুরোপের রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে, তাদের স্মরণার্থে এখানে একটী হাঁসপাতাল নির্ম্মিত হয়েছে। এই সহরটী গুর্খা-রাজার তৈয়ারী, সেইজন্য এখানকার

সবই নূতন। ইলেকট্রিক আলো, জলের কল ও বিদেশীদের থাকবার জন্য এখানে ত্রিপুরেশ্বরী Rest house আছে। ময়দানের এক কোনে একটী মনুমেণ্ট আছে, নাম তার সোমধারা বা শোনধারা। বহুদূর থেকে এই মনুমেণ্ট দেখতে পাওয়া যায়। বিগত নেপাল মহাবাক্ত সামসের জং বাহাদুর ও দুই একজন বড় সৈন্যাধ্যক্ষের প্রস্তর মূর্ত্তি এখানে আছে।

ইন্দ্রচক :—

সহরের পাশেই প্রকাণ্ড বাজার। নানা জিনিষ এখানে পাওয়া যায়—কিন্তু বেশীরভাগই জাপানী। কয়েকজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর কাপড়ের দোকান এখানে আছে। নেপাল দেশের তৈয়ারী নানা রং বেরং এর কাপড় ও জুতা এখানে বিক্রী হচ্ছে। নানা পিতলের দ্রব্য দোকানে সাজান রয়েছে। নেপাল যে এক সময় পিত্তল-শিল্পে বিখ্যাত ছিল তা এগুলি দেখলে সহজে অনুমান হয়। কয়েক-জন নেপালী চামর ও কম্বল বিক্রী করছে। পকেট খালি হবার ভয়ে বন্ধুটী তাড়াতাড়ি পাটানের দিকে চল্ল।

ললিত পাটান :—

কাট্‌-মণ্ডু সহর থেকে মাইল খানেক দূরে পাটান। সহরের রাজ-পথগুলি সঙ্কীর্ণ। দরবার-স্কোয়ার দেখতে অতি সুন্দর। এর একদিকে সারি সারি প্যাগোডার আকার বিশিষ্ট মন্দির।

এখানে অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে 'মচেন্দ্রনাথ' প্রসিদ্ধ মচেন্দ্রনাথ হচ্ছেন নেপাল রাজ্যের রক্ষক। জাতীয় সঙ্কটের সময়ে তিনি নেপাল-রাজের সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং কি উপায়ে বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে তা বলে দেন। প্রতি জুন মাসে মচেন্দ্রনাথের দেবমূর্ত্তি রথে করে বার করা হয়। এই রথ প্রায় ২৫ ফুট উচু। মচেন্দ্রনাথ রথে উঠলে বৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। মচেন্দ্রনাথকে হিন্দু ও বৌদ্ধরা সমান ভাবে পুজা করে থাকেন।

এখান থেকে কিছু দূরে চঙ্গু-নারায়ণের বৈষ্ণব মন্দির ও কীর্ত্তিপুর সহর। কিন্তু ফিরতে দেরী হবে বলে আমরা কাট্‌-মণ্ডু সহরে ফিরে চল্লাম।

কুচকাওয়াজের মাঠের পাশে রাণী-পুকুর। মাখনদা' তাঁর দলবল নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। রমেশকে

দেখে খুব আগ্রহের সঙ্গে বল্লেন—'বীরভদ্র এই রাণী-পুকুর ছাড়া আর কোন পুকুরের কথা বলতে পারলে না। এইটাই কি সেই পুকুর?' ইসারায় আমাকে চুপ করে থাকতে বলে, রমেশ তাড়াতাড়ি পুকুরের দিকে এগিয়ে চল্ল। তাকে এগিয়ে যেতে দেখে মাখনদা' একটা আশ্চর্য্য কিছু দেখবার আশায় তার পিছন পিছন চল্লেন। বন্ধু জলের ধারে গিয়ে বল্লে—আগে এখানে কোন পুকুর ছিল না। হরধনুর খানিকটা এখানে পড়ায় এই পুকুরের সৃষ্টি। পুকুরের আধ্যাত্মিক ইতিহাস শুনে মাখনদা' খুব খুসী হয়ে উঠলেন।

বাড়ীর কাছে এসে দেখি আমাদের হাইকোর্টের বন্ধু অমিয় মুখার্জ্জি একটা দোকানে বসে; পাশে এক বাঙ্গালী সাধুজী। এতদিন তাকে না দেখতে পাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শুনলুম পথে তার দুটি কারবঙ্কল হয়। বীরগঞ্জ হাঁসপাতালে সে দুটীকে 'অপারেশন' করে, দিন কতক নেপাল-মহারাজের অতিথি থেকে। ডাণ্ডিতে করে আমার পথে সাধুটীর সঙ্গে আলাপ হয়। সেই থেকে এই রুগ্ন মানুষটীর উপর তিনি তাঁর স্নেহ দৃষ্টি দিয়ে

আসছেন। অমিয় ও সাধুজীকে সাদরে আমাদের কুটীরে নিয়ে এলুম। মাখনদা'র কথা, জেঠাইমার হর-ধনুর পুকুর দেখা প্রভৃতির গল্প করে সন্ধ্যাটা বেশ আনন্দে কাটিয়ে দেওয়া গেল।

রবিবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী:—

এক এক করে সবাই চলে যাচ্ছেন। বাড়ী প্রায় খালি হয়ে এসেছে। ক'দিনের আলাপে একটা প্রীতির বন্ধন সকলের মধ্যে জেগে উঠেছিল, তা' ছিন্ন করে যেতে সকলেরই মন অল্প বিস্তর বিষন্ন হয়ে উঠছে। স্মৃতির খাতায় দুদিনের হাসি কান্না জমা করে নিয়ে আমাদেরও বেরিয়ে পড়তে হবে—হয়তো মাখনদা', জেঠাইমার দেখা এ জীবনে আর পাব না, তবুও এই পথের পরিচয়ের লাভটুকুও ত' কম নয়? ভিখারী মানুষ, সঞ্চয় তার পেশা। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে সব কিছু দু' হাত দিয়ে নিজের মাঝে টেনে নিয়ে নূতন কিছু সৃষ্টি করবার কল্পনাই ত' মানুষকে শ্রেষ্ঠ করে তুলেছে!

বেলা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও যাত্রার আয়োজন সুরু

হয়ে গেল। আর একবার দেবদর্শন করে, দেবতার আশীষ নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

দশটায় আমরা থান-কোটে পৌঁছলাম। সুশীল বাবুর জন্য একটী ডাণ্ডি ঠিক করতে হবে, কিন্তু চেয়ার-ওয়ালা ডাণ্ডি পাওয়া গেল না। শেষকালে সাড়ে এগার টাকা ভাড়ায় একটী দড়ীর খাটুলি ঠিক করা হল। রেজিষ্টারী অফিসে বেজায় ভিড়। অতি কষ্টে কুলি ও খাটুলি বাহকের রেজিষ্টারী-পর্ব্ব শেষ করে বেলা সাড়ে এগারটায় আমরা চন্দ্রাগড়ী পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলাম। অল্প উঠে দেখি বাঙ্গালী-বৃদ্ধারা কুলির ঝোলায় বা দড়ির খাটুলিতে করে চলেছেন। অনেকের আবার পুঁজি পশুপতিনাথে কমে যাওয়ায় শেষ সম্বল লাঠির উপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে পাহাড়ে উঠ্ছেন।

বেলা একটায় আমরা চন্দ্রাগড়ীর চূড়ায় এসে পৌঁছলাম। নেপালী কমলা-লেবুওয়ালার নিকট হতে কমলালেবু কিনে নামতে সুরু করা গেল। এই পাহাড়ে উঠবার সময়ে কি না কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু এখন গড় গড়িয়ে নেমে চলেছি— কোন কষ্ট মনে হচ্ছে না। নেপালী গাহকরা সুমধুরস্বরে

রামায়ণ গান করে যাত্রীদের সমস্ত কষ্ট দূর করে দিচ্ছে। বেলা আড়াইটের সময়ে আমরা চন্দ্রাগড়ী-ধর্ম্মশালার সামনে এসে উপস্থিত হলুম।

একটু বিশ্রাম করে আবাব চলা সুরু হল। আকাশে কাল মেঘ দেখে পায়ের গতিটা বাড়িয়ে দেওয়া গেল। পথের দু'ধারের দৃশ্য অতি মনোরম। মনে পড়ে যায় কোন এক অতীতের মহাবিপ্লবের কথা, যার ফলে প্রকৃতির বুকে এই অপরূপ সৃষ্টি বৈচিত্রের উদ্ভব হয়েছে।

বেলা সাড়ে পাঁচটায় আমরা কুলেখালিতে এসে পৌছলুম। ঝরণার ধারে অত বড় ধর্ম্মশালাটা যাত্রীতে একেবারে ভরে উঠেছে। দোকানের অবস্থাও সেইরূপ। অনেক কষ্টে একটা দোকানের আধখানা দেড়টাকা ভাড়ায় ঠিক হল। রাণাঘাটের এক ভদ্রলোক পশুপতিনাথে কুলি রেজিষ্টারী করে, তাকে জিনিষের ভার দিয়ে বরাবর চন্দ্রাগড়ীর ধর্ম্মশালায় এসে উঠেন। কিন্তু রাত হয়ে গেল তবুও কুলির দেখা নেই। দোকানদাররা আশ্বাস দিল কুলি খুব সম্ভব তাঁর জন্যে কুলেখালিতে অপেক্ষা করছে। সকালে উঠেই তিনি কুলেখালিতে এসেছেন, কিন্তু কুলির

সন্ধান মেলেনি। আবার ফিরে তিনি খোঁজ করতে যাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে বল্লুম, থানকোট হচ্ছে কুলিদের প্রথম Checking Station। সেখানে কুলির রসিদ না দেখান হওয়াতে এই গোলমাল হয়েছে। সামনেই শিশাগড়ী; সেইখানে কুলিদের প্রধান অফিস আছে। ওখানে গেলে নিশ্চয়ই কুলির খবর পাওয়া যাবে।

ভদ্রলোককে আশ্বাস দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম আমাদের কুলির খোঁজে—কি জানি যদি আবার আমাদের অদৃষ্টে ঐরকম কিছু বিভ্রাট লেখা থাকে। একটু পরে কুলিকে আসতে দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ষ্টোভ জ্বালতে বসলুম; কিন্তু দেখি Heaterটা পশুপতি-নাথে ফেলে এসেছি। ঘরে একটা উনুন পাতা আছে কিন্তু তার ফাঁকটা এত বড় যে আমাদের ছোট হাঁড়ী বসবে না। রাত্রে রান্নার উপায় হবে না শুনে রমেশ বসে পড়ল। গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিল যে আজকে রাত্রে পুরীর ব্যবস্থা হলে কালকে তারপক্ষে শিশাগড়ীর চড়াই উঠা সম্ভব হবে না। বন্ধু বেরিয়ে পড়ল খাবারের চেষ্টায়। খানিক বাদে একটা ঝক্‌ঝকে পিতলের হাঁড়ী নিয়ে হাজির; শুনলুম সবই

নাকি ভাড়া পাওয়া যায়। হাঁড়ী ত' পাওয়া গেল, কিন্তু কাঠ ভিজে, উনুন কিছুতেই ধরে না। রমেশ আবার শুকনো কাঠ আনতে ছুট্‌লো।

ক্লান্তিতে চোখ দু'টো ঢুলে আসছে। কিন্তু পেটের জ্বালা ঘুমকে কাছে ঘেঁসতে দিচ্ছে না। রাত গভীর হয়ে উঠছে, তবুও দলে দলে যাত্রী এখনও থানকোট থেকে আসছে। একে দুরন্ত শীত, তার উপর সমস্ত দোকান ভর্ত্তি। এই সব যাত্রীরা যে কোথায় যাবে তার কোন ঠিক নেই। পথে আছে গাছতলা—ধর্ম্মের নামে পাগল এই যাত্রীদল হয়তো সমস্ত রাতটা গাছতলায় কাটাবে।

বিংশ শতাব্দীর মানুষ আমরা, বিজ্ঞানের চাপে ধর্ম্মকে পিষে ফেলতে চলেছি। কলেজের দু'পাতা শিক্ষাতেই আমরা বুঝে নিয়েছি—ধর্ম্ম একটা কুসংস্কার। ফ্রয়েড থেকে হলিউড্ পর্য্যন্ত আমাদের মুখে মুখে ঘোরে। ইউনি-ভারসিটির চাপে পড়ে Old Testament, New Testa ment ও বাধ্য হয়ে দু'পাতা পড়তে হয়েছে, কিন্তু বেদ উপনিষদ্ ত' দূরের কথা, রামায়ণ মহাভারতের নাম এক ইতিহাসের পাতা ছাড়া বড় একটা কোথাও চোখে পড়ে

না। অতএব ধর্ম্মের কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের যে শ্রদ্ধা ভালবাসা সে দিক থেকে দেখলে এর কি কোন প্রতিকার করা আমাদের উচিত নয়?

পাহাড়ের রাস্তায় বিপদ পদে পদে। আশ্রয় ত' দূরের কথা, দরকার হলে, পাহাড়ের ত্রি-সীমানায় একজন হাতুড়ে ডাক্তারকেও পাওয়া যাবে না। অথচ কাট্-মণ্ডু সহরে বাঙ্গালী ডাক্তার ভর্ত্তি বড় বড় হাঁসপাতাল আছে!

প্রতি বৎসর হাজার হাজার যাত্রী এই সময়ে পশুপতি-নাথ দর্শন করতে যায়। তাদের অর্থে নেপালের রাজ-ভাণ্ডার বেশ কিছু পূর্ণ হয়ে ওঠে। অথচ তাদের দুঃখ কষ্টের দিকে নজর দেবার দরকার কেউই মনে করে না।

মনে পড়লো কাট্-মণ্ডু সহরের British-legation এর আকাশ ফাটান বাড়ীটার কথা। কিন্তু একটা পরা-ধীন জাতের সুখ দুঃখের কথা ভাববার অবসর বোধ হয় তাঁদের হয়ই না!

সোমবার—২৪শে ফেব্রুয়ারী :—

ভোরের সঙ্গে সঙ্গে সুশীলবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পাহাড় পাড়ি দেবার জন্যে। কিন্তু কুলির এখনও দেখা নেই। রাতের বৃষ্টিটা এখন থেমেছে কিন্তু পথ আরও পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। সামনেই শিশাগড়ীর ভীষণ চড়াই। যাত্রীরা এর মধ্যেই তাদের ছোট ছোট পোঁটলা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। কুলিকে অনেক কষ্টে সন্ধান করে সকাল সাড়ে ছটায় যাত্রা করা গেল।

একদিন রাত্রে যার অস্পষ্ট রূপ দেখে প্রাণে আতঙ্ক জেগে উঠেছিল, আজ দিনের আলোয় তার স্বরূপ দেখতে দেখতে চলেছি। পাতাল-পুরী থেকে একটা পায়ে চলা পথ যেন আকাশের দিকে এগিয়ে চলেছে—একদিকে তার খাড়া পাহাড় অপরদিকে বিশাল খাদ।

লাঠিরউপর ভর দিয়া যাত্রীরা সেই সরুপথ ধরে এগিয়ে চলেছে। মুখে তাদের একই কথা—কি কষ্টে তাদের রাতটা কাল কেটেছে। যাত্রীদের মধ্যে অনেকে

এর আগে কেদার ও বদ্রিনারায়ণে গিয়েছেন, কিন্তু তার পথ নাকি এত কষ্টকর নয়। সেখানে পথের দুধারে আছে চটী আর আছে কালী-কম্বলিওয়ালার দয়া।

কেদার তীর্থ সেরে কেন তাঁরা এই দুর্গম দেশে আসতে বাধ্য হয়েছেন তার একটা সুন্দর গল্প বল্লেন।

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পর একদিন স্বয়ং পশুপতিনাথের উপর পাণ্ডবশিবির রক্ষার ভার দিয়ে পঞ্চ-ভাই পাণ্ডব গেলেন কোথায় কি কাজে। ইতিমধ্যে অশ্বত্থমা এসে স্তব করে শিবকে প্রসন্ন করলেন। তাঁর স্তবে তুষ্ট হয়ে মহাদেব চলে গেলেন কৈলাসে। অশ্বত্থমা দ্রৌপদীর পঞ্চ-পুত্রকে পঞ্চ-পাণ্ডব ভেবে বধ করলেন।

পাণ্ডবেরা ফিরে এসে এই করুণ দৃশ্য দেখলেন। ভীম ছুটলেন কৈলাসে শিবের কাছে। তাঁর ভয়ে মহাদেব মহিষের রূপধরে একদল মহিষের ভিতর ঢুকে গেলেন। ভীম মহা ফাঁপরে পড়লেন। দলের ভিতর থেকে মহাদেবকে পৃথক করবার জন্য ভীম এক ভীষণ মূর্ত্তি ধরলেন। কেদার-নাথে এক পা ও নেপালে আর এক পা দিয়ে তিনি মহিষদের সামনে দাঁড়ালেন। একটী ছাড়া আর সব মহিষই

তাঁর পায়ের তলা দিয়ে চলে গেল। শিব হচ্ছেন ভীমের গুরু। সুতরাং তিনি ভীমের পায়ের তলা দিয়ে যেতে পারলেন না। ভীম বুঝতে পারলেন, কোনটা মহাদেব। তিনি মহিষটার পিছনে ছুটলেন। কেদারে গিয়ে দেখলেন মহিষটার পিছনটা পড়ে রয়েছে, মুখটা রয়েছে নেপালে।

সেই থেকে একটা প্রবাদ চলে আসছে যে, যাঁরা কেদার দেখে নেপালে না যাবেন তাঁরা হবেন পশু। সেইজন্য যাত্রীরা নেপালে এসেছেন তাঁদের পশুত্ব খণ্ডন করতে।

বেলা ন'টার আমরা শিশাগড়ীর ধর্ম্মশালায় এলুম। রাণাঘাটের ভদ্রলোকের কুলির সন্ধান করা হল। শুনলুম চার জন কুলি এগিয়ে ভীমফেরীতে গিয়েছে। সেখানে যদি না কুলিকে দেখতে পাই, তাহলে এখানে এসে খবর দিলে, প্রভুরা দয়া করে তাদের অনুসন্ধান করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। এঁদের কাছে ভীমফেরী ও শিশাগড়ী যেন এ বাড়ী ওবাড়ী—কিন্তু আমাদের কাছে যে একদিনের পথ!

একটু বিশ্রাম করে আবার চলা সুরু হল। এখানকার একদল লোক যেরকম খুব দরিদ্র, আর একদল আবার

সেই রকম ধনী। কুলিদের মত এত দরিদ্র আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। সম্বলের মধ্যে তাদের একটী ছেঁড়া পায়জামা ও একটা কোর্ত্তা। সরাব টেনে হাড় ভাঙ্গা শীতের হাত থেকে তাদের নিস্তার পেতে হয়। তাদের খাওয়াটাও আবার বিচিত্র। মহিষের মাংস ও মোটা মোটা রুটি খেয়ে তারা দিন কাটায়।

বেলা এগারটায় আমরা ভীমফেরীতে পৌঁছলাম। রাণাঘাটের ভদ্রলোক তাঁর কুলির দেখা পেলেন। তাঁকে আবার হেঁটে শিশাগড়ীতে ফিরতে হবে না ভেবে আনন্দিত হলুম। বন্ধুটী এক দোকানে একটা কাঁচের গেলাস ভেঙ্গে এখানকার সব দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিল।

লরীতে করে বেলা দু'টয়ে আমরা আমলেখগঞ্জে পৌঁছলাম। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণ পাওয়া গেল। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আমরা রক্সোলে পৌঁছলুম।

সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে ষ্টেশান যাত্রীতে ভরে গেল। যাত্রীদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। অনেকেই বাংলা দেশের বিভিন্ন পল্লী থেকে একা এসেছেন। আসবার সময় যাহোক করে এসেছেন কিন্তু কী করে যে ফিরবেন তারই

সমস্তায় পড়েছেন। এখান থেকে ফিরবার হুটী পথ—একটী সাগুলী হয়ে,আর অপরটী দ্বারভাঙ্গার মধ্যে দিয়ে। কে কোন দিক দিয়ে যে ফিরবে তাই নিয়ে খুব গোলমাল চলছে। ষ্টেশানমাষ্টার তাঁর সাধ্যমত সকলকে সাহায্য করতে লাগ্‌লেন।

রাত আটটায় ট্রেণ ছাড়লো। বৃদ্ধারা তাঁদের নাতি নাতনীদের জন্ত কেনা উপহারের পোঁটলা সামলাতে ব্যস্ত। বাড়ী ফেরার আনন্দে সকলেই ভরপুর।

বারটায় আমরা বইরাগনিয়ায় পৌঁছলাম। সেখান থেকে ট্রেণ বদল করে দ্বারভাঙ্গার ট্রেণে উঠে পড়লুম। পথে পড়ল সীতামারী ও জনকপুর রোড ষ্টেশান। জনকপুর রোডষ্টেশান থেকে বাস্ পাওয়া যায়। সেই বাসে ২৪ মাইল গেলেই রামসীতার মন্দির। সেইখানে প্রসিদ্ধ হর-ধনু ভঙ্গ হয়—যাকে নিয়ে রমেশ নেপালে এত কাণ্ড করে বসল।

জনকপুর ছাড়ালে কাম্‌টোল ষ্টেশান পড়ে। এই ষ্টেশানের নিকটে অহল্যাদেবীর মন্দির। এখানে অহল্যা পাষান হয়ে ছিলেন।

মঙ্গলবার ২৫শে ফেব্রুয়ারী :—

আকাশ ধূষর হয়ে আস্‌ছে। দূরে দ্বারভাঙ্গার ষ্টেশান দেখা যাচ্ছে। সুশীলবাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল যে তাঁর বৈরাগ্যের ভাবটা একেবারে চলে গেছে। আমাদের পথও শেষ হয়ে এলো।

* * * সমস্ত দিনটা গেল কয়দিনের সুখ দুঃখের ইতিহাস নিয়ে। বৈকালে একবার দ্বারভাঙ্গার রাজপ্রাসাদ দেখে আসা গেল।

বুধবার ২৬শে ফেব্রুয়ারী :—

বেলা দুটো। দ্বারভাঙ্গার ষ্টেশানে সুশীলবাবুর নিকট হতে বিদায় নিলুম। তিন জনের একজনকে রেখে আবার আমরা দু'জনে ফিরে চলেছি। যাবার সময় কত উল্লাস কত উৎসাহ, কিন্তু ফিরতি পথে মনে সে উল্লাস নেই। দেখার চেয়ে না দেখার আনন্দ বোধ হয় বেশী। কল্‌কাতায় নেপালের যে রূপ মনে এঁকেছিলুম, বাস্তবের রূঢ় আঘাতে তা' চূর্ণ হয়ে গেছে। মনে হয় যা দেখেছি তার থেকেও সুন্দর হওয়া বুঝি উচিত ছিল। বারুণীতে বন্ধু অমিয় ও সাধুজীর সঙ্গে দেখা হলো। সাধুজী যাবেন কিউলে, বন্ধু কলিকাতায়; আমরা যাব দেওঘরে।

* * * রাত তখন বারটা। কর্ম্মক্লান্ত পৃথিবী গভীর সুপ্তিতে মগ্ন। গাড়ী এসে থামলো যশিডির ষ্টেশানে। মামু ও চক্র প্ল্যাট্‌ফরমে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। * * দূরে ডিস্‌ষ্টেণ্ট্‌ সিগনালের লাল আলোটা জ্বল জ্বল কচ্ছে। * * *